ঠিক-ঠিকানা

চিত-চিতাল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ
কবিপক্ষ, ১৩৬২

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২২০০
শ্রাবণ, ১৩৬৩

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

রাধাগোবিন্দ রায়

বন্ধুবরেষু

এই উপন্যাসটি 'চক্রাবর্ত' নামে
শারদীয়া বসুমতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

যে সময়ের কথা বলছি—কলকাতা শহরের এত উন্নতি তখনও হয়নি। ছোট ছোট নোংরা গলি ছিল বিস্তর, আর ছিল খোলার খাপ্‌রার বড় বড় বস্তি।

এমনি একটা খোলার বস্তির সুমুখে ছিল প্রকাণ্ড লম্বা একটা দোতলা বাড়ী। বাড়ীর দু' দিকে ছিল কাঠের রেলিং-দেওয়া বারান্দা। আর সেই বারান্দার সামনে পাশাপাশি ঘরের পর ঘর। কতগুলো ঘব তা গুণে কোনোদিন দেখিনি। তা তিরিশখানা ঘরের কম তো নয়ই, বরং বেশী।

বাড়ীটা একেবারে জরাজীর্ণ। কতকাল আগে যে তৈরি হয়েছে তা কেউ বলতে পাবে না। কেউ বলে, মিছরির কারখানা ছিল, কেউ বলে পাটের গুদাম, আবার কেউ কেউ বলে, গোরা পল্‌টনদের থাকবার জন্য তৈরি হয়েছিল এ ব্যারাক্‌।

কিন্তু কোন্‌টা যে সত্য তা কেউ জানে না। ব্যাপারটা চোখে দেখা কাবও নয়। যাঁরা দেখেছেন, এ-যুগে তাঁদের সন্ধান পাওয়া কঠিন, কাজেই অভ্রান্ত সত্য বলে' কোনোটাই বিশ্বাস করা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। সুমুখের রাস্তা দিয়ে আসছিল একটা বিরাট মোটরলরি, কয়েকটা গরুর গাড়ীকে পাশ কাটাতে গিয়ে লাগলো ধাক্কা এই বাড়ীটার গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমদিকের দোতলার খানিকটা অংশ হুড়মুড় করে' ভেঙ্গে পড়লো রাস্তার ওপর।

লরিটা গেল বেঁচে। তার গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগলো না। লেগেছে কিনা তাও কেউ দেখতে পেলে না। রাস্তার গ্যাসেব আলো

তখন কোনোটা-বা জ্বলেছে, কোনোটা-বা জ্বলেনি। আওয়াজ শুনে এদিক ওদিক থেকে লোকজন এসে যখন জড়ো হ'লো, লরির ড্রাইভার তখন প্রাণের ভয়ে লরি নিয়ে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে পালিয়েছে তা কেউ টেরও পায়নি।

বাড়ীর লোকজন কেউ মরেনি। কারণ দোতলার কোণের ঘরের দেওয়ালে নাকি প্রকাণ্ড একটা ফাটল হয়েছিল, আর সেই ফাটলের মুখে কে যেন একদিন একটা গোখ্রো সাপের খোলস দেখেছিল, তার পর থেকে পশ্চিমদিকের দু'খানা ঘর খালি পড়ে থাকতো।

সেই খালি ঘর দু'খানার একখানা গেল।

বাড়ীর মালিকের কাছে কর্পোরেশনের নোটিশ এলো—হয় বাড়ীখানা ভাল করে' মেরামত কর, আব নয়তো একেবারে ভেঙ্গে দাও। এক মাসের নোটিশ।

বাড়ীর মালিক ব্রজকিশোরবাবু তখন বাস করেন একখানা ভাড়া-বাড়ীতে।

এ-বাড়ীটা সপরিবারে বাস করার উপযুক্ত যদিও নয়, তবু ভাবলেন, মেরামত যখন করতেই হবে, তখন একটু ভাল করে' মেরামত করিয়ে এইখানে উঠে এলেই তো হয়!

দোতলার এক একখানা ঘরের ভাড়া মাত্র তিন টাকা।

দশখানা ঘর, তিরিশ টাকায় ভাড়া নিয়েছেন এক ভদ্রলোক। 'মেস্' করেছেন। নাম—'ইম্পিরিয়াল্ বোর্ডিং হাউস'। বাকি ঘরগুলো নাকি ব্যবহারের অযোগ্য। ভাড়া বারো মাস থাকে না। লোকজন আসে। মাসখানেক কি বড়-জোর মাস-দুই থাকে, তার পর কেউ-বা ভাড়া দেয়, কেউ-বা ভাড়া না দিয়েই রাতারাতি পালায়।

'ইম্পিরিয়াল্ বোর্ডিং হাউসে'র পাশের একখানা ঘরে আছে

একটি কবিরাজী ঔষধালয়। একটিতে 'ম্যারেজ্ ব্যুরো'। আর-একটিতে 'রয়েল্ লণ্ড্রি'।

সবার নামেই নোটিশ এলো। বাড়ী ছেড়ে উঠে যাবার নোটিশ। এই বাড়ীর নীচের তলায় যে-সব ঘর আছে, সেই ঘরে তারা যদি যেতে চায় যাক্, নইলে একেবারে যদি চলে যায়, তাতেও তাঁর বিশেষ ক্ষতি নেই।

ইট সুরকি এসে জমা হতে লাগলো—বাড়ীর উঠোনে।

সাঁকোর মত ভাঙ্গা সিঁড়িটার পাশে অন্ধকার গর্ত্তের মত একটা ঘবে থাকে একজন হিন্দুস্থানী। তাবই পাশে যে-ঘরটায় পাড়ার বেকার ছেলেরা প্রত্যহ সন্ধ্যায় থিয়েটারের রিহার্শ্যাল্ চালায়, তাস খেলে আর গল্পগুজব করে, সেই ঘরের ভেতর রাখা হ'লো চূণ বালি আর কিছু সিমেণ্ট। ছেলেগুলো সন্ধ্যেবেলা এসে দেখলে, দোরে তালা ঝুলছে।

ছু'-একদিনের ভেতরেই কাজ সুরু হয়ে গেল। জরাজীর্ণ এই বাড়ীটার সংস্কাবের কাজ।

ভাঙা কার্নিশেব ধারে ধাবে যে-সব আগাছার জঙ্গল দিনে দিনে নির্ব্বিঘ্নে বড় হয়ে উঠছিল সেগুলো প্রথমে কেটে ফেলা হলো। নতুন ইট দিয়ে ভাঙ্গা কার্নিশ মেবামত হয়ে গেল। ঘরের ভেতর-বার চূণ ফেরানো হ'লো। বহুদিনের পুরনো কাঠেব রেলিং জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গে ঝুলে পড়েছিল ; সেগুলো মেরামত করে' রং দেওয়া হ'লো। কালো আলকাতরার কল্যাণে চিক্ চিক্ করতে লাগলো।

বাকি রইলো নড়বড়ে সিঁড়িটা আর নীচের অন্ধকার গর্ত্তের মত ঘরগুলো। অনেক চেষ্টা করেও তাদের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করা গেল না। অত-বড় সিঁড়িটা আগাগোড়া ভেঙ্গে আবার নতুন করে মেরামত করা—সে এক ছুঃসাধ্য ব্যাপার।

নীচের সতেরোখানা ঘরের মধ্যে মাত্র পাঁচখানা ঘরে অত্যন্ত সস্তা ভাড়ায় অন্ততঃ পক্ষে তিরিশ জন মানুষ বাস করে। বাকি বারোখানা ঘর দিনের বেলা খালি পড়ে থাকে। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার নামতে-না-নামতেই দেখা যায়, ধীরে-ধীরে সেগুলো ভর্ত্তি হয়ে গেছে। সে-সব ঘরে অবশ্য রৌদ্র প্রবেশ করে না। অন্ধকার আবর্জ্জনায় দিবারাত্রি সেখানে একরকম বিশ্রী দুর্গন্ধ উঠতে থাকে। তবু সেখানে বাস করবার জন্য মানুষের অভাব হয় না। পচা ঘায়ের ওপর কৃমির মত বিস্তর মানুষ সেখানে রাত্রির অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়।

নিশাচর জীব-জন্তু ছাড়া কোনো মানুষ যে সেখানে বাস করতে পারে—দিনের বেলা দেখলে সে কথা মনে হয় না।

চূণ সিমেণ্ট রেখে একখানা ঘর অবশ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নীচের তলায় ঘরের অভাব নেই। রাত্রে দেখা যায়, তার পাশের ঘরখানা তারা দখল করে' বসেছে। দেয়াল থেকে ছিঁড়ে আনা থিয়েটার-সিনেমার বড় বড় পোষ্টারের ওপর বাঁশের দরমা আর ছেঁড়া চট পাতা হয়েছে, কেরোসিনের একটা কুপি জ্বলছে আর ঘরভর্ত্তি হিন্দুস্থানী ছেলে-ছোক্‌রার দল সঙ্গীতের নামে হিন্দী সিনেমার গানগুলি সমস্বরে গেয়ে চলেছে।

প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও কিছুই হয়নি।

সুমুখের বস্তি থেকে রোজ যেমন আসে, সেদিনও তেমনি তাদের দড়ির খাটিয়া দু'টি এনে একটি ঘরের ভেতর শুয়ে পড়েছে।

একটা ঘরে জুয়ার আড্ডা বসেছে আর একটা ঘর দখল করেছে মানুষের বদলে শহরের দু'টি ষাঁড়।

বাড়ীখানি মেরামত করতে ব্রজকিশোরবাবু চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। নীচের কয়েকটি ঘরে অবশ্য স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা রয়েই গেল।

কয়েকটা ঘরে প্রাণের ভয়ে মজুরেরা ঢুকতে চাইলে না। বললে, ঘরের ভেতর ইঁদুরের গর্ত্তে একদিন একটা সাপ তারা নাকি নিজের চোখে দেখেছে।

যাই হোক্, গৃহ-সংস্কারের এই সব দুঃসাধ্য কর্ম্ম শেষ হয়ে গেল। 'ইম্পিরিয়াল্ বোর্ডিং হাউসে'র অধিবাসীদের স্থানান্তরে যাবার কথাটা বলবার জন্য ব্রজকিশোরবাবু একদিন নিজে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

রবিবারের দুপুর। সপ্তাহের মধ্যে আজ তাদের বিশ্রামের দিন। আজ আর কেউ কোথাও যাবে না জেনেই তিনি এসেছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই হাতখানেক চওড়া বারান্দা। তার পরেই সারি সারি ঘর। ডানদিকের প্রথম ঘরখানি খালি। এ-ঘরে কেউ বাস করে না। জনবাদ নাকি এ-ঘরে একজন যক্ষ্মার রুগী মারা গেছে। তার পাশের ঘরখানি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দোরে একটি রঙিন পর্দ্দা ঝুলছে। পর্দ্দা সরিয়ে ব্রজকিশোরবাবু দেখলেন, অল্পবয়সী একজন যুবক নিবিষ্টমনে কি যেন লিখছে। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনাদের সেই যে সেই—আঃ হা, নামটিও ভুলে গেলাম। সেই যে—বগলে দু'টো ঠেঙ্গো নিয়ে হাঁটেন—খোঁড়া—

ছোকরাটি একটু মুচকি হেসে বললে: লণ্ড্রি, সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট? ওই ঘরে।

বলেই সে আবার তার লেখা সুরু করলে।

ব্রজকিশোরবাবু পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন—ঘরের মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে কে একটা লোক সর্ব্বাঙ্গে সাদা-সাদা ওষুধ লাগিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সম্ভবতঃ পাঁচড়া হয়েছে।

তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তিনি এগিয়ে গেলেন।

পাশের ঘরটা মানুষে আর জিনিসপত্রে ঠাসা। দেওয়ালের গায়ে

নানা রকমের মাটির হাঁড়িকলসী থাকে থাকে সাজানো। এক দিকে টিনের কয়েকটা তোরঙ্গ। এক পাশে একটা খাটের ওপর কে যেন একটা লোক আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে দিবানিদ্রা উপভোগ করছে। আর একটা কমবয়সী ছেলে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে মেঝের ওপর বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

জুতোর শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ব্রজকিশোরবাবুকে ছেলেটা বোধ হয় চিনতো। ধড়মড় করে' উঠে দাঁড়িয়েই বললে: আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন!

ব্রজকিশোরবাবু ভেতরে ঢুকে কোথায় যে বসবেন বুঝতে পারছিলেন না। দেখলেন, হাতভাঙ্গা একখানা চেয়ার রয়েছে ঘরে। তারই ওপর তিনি বসতে যাচ্ছিলেন, ছেলেটি হাঁ হাঁ করে' চেঁচিয়ে উঠলো। ব্রজকিশোরবাবু চমকে তার দিকে ফিরে তাকালেন। ছেলেটি বললে: ওতে বসবেন না, ওটা ভাঙ্গা।

তাই হোক্! উনি ভেবেছিলেন বুঝি বা হঠাৎ কোনও বিপদ হয়ে গেল।

ছেলেটি বললে: এই যে এইখানে—কাকার 'সিটে' বসুন। বলেই সে ছোট-খাটখানা আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে।

কোনো রকমে তিনি বসলেন তারই ওপর।

দোরের পাশে দেওয়ালের গায়ে পেরেকের ওপর চামড়ার ফিতে-লাগানো একজোড়া কাঠের খড়ম টাঙানো ছিল। সেই দু'টি পায়ে দিয়ে ছেলেটি বললে, আপনি বসুন, আমি ডেকে আনছি। উনি আমার কাকা।

কোথায় গেছেন তিনি?

সুমুখে খোলার বস্তির দিকে আঙুল বাড়িয়ে কয়েকটি টিনের ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে: ধোবী মহল্লায়।

ব্রজকিশোরবাবু একটুখানি উৎসুক হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: ওখানে কি করছেন তিনি ?

কাকা তো ওইখানেই কাজ করে। টেনিয়া ধোবী রসিদ দিয়ে কাপড় কাচে, কাকা ওর রসিদ লিখে দেয়, হিসেব রাখে।

বলেই সে তার খড়মের প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে চলে গেল।

ও-ঘরের ওই ছোকরাটি বলেছিল—'লণ্ড্রি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট'। কথাটির মানে এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরেই আপন মনেই হেসে ফেললেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ সুমুখের দিকে তাকাতেই তাঁর মুখের হাসি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যে-বাড়ী এই সেদিন অর্থাৎ গত পরশু তারিখে চূণকাম করিয়েছেন তিনি, সেই বাড়ীর সাদা দেয়ালের ওপর কাল কাঠ-কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে কে যেন লিখে রেখেছে—গয়লানী—তেইশে ভাদর। আর তার নীচে—**Tmeenli fife Aghast father 15 Rupee.**

দেওয়ালের গায়ে এম্‌নি আরও কোথাও কিছু হিসেব লেখা আছে কিনা দেখবার জন্যে তিনি একবার ঘুরে-যিরে চারদিক তাকিয়ে দেখলেন। দেখলেন, হিসেব কোথাও কিছু লেখা অবশ্য নেই, কিন্তু অসংখ্য পেরেকের ছিদ্রে ঘরের চারটে দেওয়াল একেবারে ভরা। কোথাও জুতো টাঙানো, কোথাও-বা ক্যালেণ্ডার, কোথাও-বা তেলের শিশি। আবার এক একটা ছিদ্রের মুখে পোড়া দেশলাই-এর কাঠি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম যে কেন করা হয়েছে প্রথমে তিনি বুঝতে পারেননি। অনেক গবেষণার পর আবিষ্কার করলেন, ছারপোকা মারবার জন্যে সম্ভবতঃ এই সব গর্তের মুখে দেশলাই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের প্রত্যেকটি 'সিটে'র মাথার ওপরে দড়ি দিয়ে বাঁধা শমীবৃক্ষে মৃতদেহ টাঙিয়ে রাখার মত এক একটি সুবৃহৎ পুঁটুলি

ঝুলছে, কোনোটি-বা খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া, কোনোটি-বা শতছিন্ন মলিন বস্ত্র-খণ্ড দিয়ে আবৃত। এ বস্তুগুলি যে কি হ'তে পারে অনেক চেষ্টা করেও তিনি ঠাহর করতে পারছিলেন না। অবশেষে ছেঁড়া একটা কাপড়েব ভেতর দিয়ে খানিকটা সাদা তুলো তাঁর নজরে পড়তেই তিনি বুঝলেন—দুরন্ত শীতের সম্বল তাদেব লেপ-কাঁথাগুলি এখন এই গ্রীষ্মের দিনে তারা সযত্নে তুলে রেখেছে।

এই সব দেখতে দেখতে ছারপোকার কামড়ে অস্থির হয়ে হঠাৎ এক সময় তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, এখানে বসে থাকার চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লো না, পেছনে প্রচণ্ড খটাখট্ শব্দে সচকিত হয়ে মুখ ফিরিয়েই দেখেন, লণ্ড্রি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও তাঁব ভ্রাতুষ্পুত্র আসছেন। একজনেব পায়ে কাঠের খড়ম, আব একজনেব দুই বগলে লোহা-বাঁধানো ক্রাচ্। তায় আবার মাথার ওপর টিন দেওয়া নড়বড়ে বাবান্দা। শব্দ হওয়া স্বাভাবিক।

এই ভদ্রলোকের বাঁ পায়েব হাঁটুর নীচের দিক্টা নেই। কোথায় কোন্ রেল-ষ্টেশনে নাকি কাটা পড়েছিল। সে কাটা পায়েব এক লম্বা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস দয়াময়ের মুখ থেকেই তিনি শুনেছেন।

এর নাম দয়াময় হালদার।

দয়াময় তার বগল-দাবা ঠেঙ্গো দু'টি কাৎ কবে' তার সেই পাংলা ছিপ্ছিপে দেহটিকে সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে বাঁকিয়ে প্রথমে একটি নমস্কার করলে, তার পর অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে অতিশয় বিনম্র ভাবে বললে, তাহ'লে মনে আছে এ-অধীনকে ?

—হ্যাঁ আছে। কিন্তু এ-সব কি ?

আঙুল বাড়িয়ে ঘরের দেওয়ালগুলো দেখিয়ে ব্রজকিশোরবাবু বললেন, এই না দুদিন আগে চুণ দেওয়া হ'লো ?

দয়াময়ের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও দাঁড়িয়েছিল তার পাশেই। তার একখানা হাত সে চেপে ধরে বললে, এই—এ করেছে। নিন্ মারতে হয় মারুন, কাটতে হয় কাটুন। এ আমার ভাইপো।—এই শূয়ার, পেন্নাম কর্! পায়ের ধুলো নে!

থাক্ থাক্। বলে ব্রজকিশোরবাবু বলতে আরম্ভ করলেন, শুনুন আমি যেজন্য এসেছি। আপনাদের দয়া করে' এই ঘরগুলি সব ছেড়ে দিতে হবে।

দয়াময় বললে, সে কি কথা বলছেন সার্? ও আমি এক্ষুনি মুছে ফেলছি। এক পোঁচ চূণ আমি এক্ষুনি লাগিয়ে দিচ্ছি—দেওয়াল-গুলো আবার দেখবেন সাদা ধব্ ধব্ করবে।

এই বলে দয়াময় দেওয়ালের গায়ে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের কীর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, না না, আমি সেজন্যে বলছি না। আসছে সোমবারের আগেই আপনাদের নীচে নেমে যেতে হবে। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে এইখানে এসে থাকবো কিছুদিন।

দয়াময়ের সে বিনয়াবনত গদগদ ভাব মুহূর্ত্তেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। হাতের ক্রাচ্ দুটো খাটের ওপর নামিয়ে সে এক অদ্ভুত উপায়ে বসে পড়লো সেইখানেই। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, এখানে কিন্তু আপনি থাকতে পারবেন না সার্।

ব্রজকিশোরবাবুর সে আশঙ্কা যে ছিল না তা নয়। বললেন: কেন?

—এ এক মহামারী জায়গা সার্। এ জায়গা আপনাদের জন্যে নয়, আমাদের জন্যে। বলেই সে হাত বাড়িয়ে সুমুখের ধোবী মহল্লা এবং তার আশপাশের বস্তিগুলো দেখিয়ে দিলে।

—তা হোক্। আমি আসবো।

ব্রজকিশোরবাবু ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

দয়াময়ের শুকনো মুখ আরও শুকিয়ে গেল। বললে, তাহ'লে আপনি কি—

কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়েই ব্রজকিশোরবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন : হ্যাঁ আসবো। কিন্তু শুনুন একটা কথা। নীচের ঘবগুলো ভাল নয় আমি জানি। আপনাদেব যদি পছন্দ না হয়, যতদিন না অন্য বাড়ী পাচ্ছেন, ততদিন আমাকে ভাড়া দিতে হবে না।

দয়াময় একটি শুষ্ক নমস্কার করলে হাত দু'টি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে। উঠে দাঁড়ানো উচিত ছিল, কিন্তু খোঁড়া মানুষ, বার বার উঠে দাঁড়ানো শক্ত। নমস্কাব করলে আর মুখে বললে, আপনাব অনুগ্রহ।

ব্রজকিশোরবাবু চলে গেলেন।

তাঁর পায়েব শব্দ যখন আর শুনতে পাওয়া গেল না, দয়াময় হেসে উঠলো আপন মনেই। বললে, হয়ে গেছে বাছাধনেব! ওহে ও যতীন, ওঠো, ওঠো।

যে-লোকটি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল, হঠাৎ সে নড়ে উঠলো। তেমনি শুয়েই বললে, শুনেছি সব।

দয়াময় বললে, ঘুমোওনি তাহ'লে?

যতীন বললে, না। যে ছারপোকা! বাবাঃ!

বলতে বলতে সে তার মুখের ঢাকা খুলে উঠে বসলো। যেমন বিরাট মুখ, তেমনি বিরাট দেহ। গলার আওয়াজও চমৎকার!

দয়াময় বললে, একটা মিটিং কল্ করা যাক্ আজ রাত্রে। না কি বল?

যতীন বললে ঃ কি হবে মিটিং কল্ করে ?

দয়াময় বললে, বোর্ডিং-এর সবাই যদি নীচে যেতে না চায় ?

—যেতে হবেই। মালিকের হুকুম। প্রতিবাদ করে' লাভ নেই।

দয়াময় কি যেন ভাবছিল। যতীন বললে, বিনা ভাড়ায় থাকবার লোভটাও তো কম নয়।

দয়াময় বললে, কিন্তু নীচেটা যে বড্ডো নোংরা যতীন !

—আমরা নিজেরাও তো নোংরা-নচ্ছারের একশেষ। নিজের দিকে তাকাও না কেন ? বলেই যতীন তার পেশীবহুল লোমশ হাতখানা দয়াময়ের জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিলে।

দয়াময় হাঁ হাঁ করে' বাধা দেবার চেষ্টা করলে একবার।

কিন্তু চেষ্টা বৃথা।

যতীন তার পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে' বললে, তোমার টাকা-পয়সায় হাত দেবো না দয়াময় ! ও তোমার চুরি-করা পয়সা। একটা বিড়ি নিলাম। দেশলাই দাও।

দয়াময় পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে' তার হাতে দিয়ে বললে ঃ তুমি কি বলছো যতীন, নীচেই আমাদের যেতে হবে ?

যতীন বিড়িটা ধরিয়ে দেশলাই-এর বাক্সটা তার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে ঃ আমরা নীচের তলার মানুষ, ওপর তলা আমাদের ধাতে সয় না। ভগবান তাই বার-বার ঘাড়ে ধরে আমাদের নীচে নামিয়ে দেয়। তবু আমরা বুঝতে পারি না— নীচেই যদি যাও তো আমার ওই পেতলের ঘটিটা আর মাদুরটা নিয়ে যেয়ো।

সাদা একখানা চাদর ঝুলছিল দড়িতে। সেইটে টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলে যতীন বেরিয়ে যাচ্ছিল। দয়াময় জিজ্ঞাসা করলে ঃ যাচ্ছ নাকি ? ফিরবে কখন ?

যতীন বললে ঃ ভগবান জানেন ।

—তোমার খাবার রাখবো না ?

কখন রাখো ? রাখতে হবেও না । বলেই বিড়ির ধোঁয়ায় ঘরখানা ভরিয়ে দিয়ে চলে গেল যতীন । দয়াময়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বাচ্চু অনেক আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাইরের বারান্দায় । কাঠের রেলিং-এর উপর হাত রেখে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছিল ।

যতীন তারই পাশ দিয়ে যাবার সময় বাচ্চুর মাথায় একটা চাঁটি মেরে বললে ঃ এখানে কি জন্যে এসেছিস মরতে ? দেশে চলে যা । এখানে মানুষ থাকে না বাবা, থাকে সব জানোয়ার ।

বাচ্চু রেগে উঠলো । তার কাকাবাবু রয়েছেন এখানে । তিনিও কি তাহ'লে জানোয়ারের সামিল হয়ে গেলেন ? বললে ঃ আপনি চুপ করুন যতীনবাবু, আমি আমার কাকাবাবুর কাছে এসেছি ।

যতীন হো-হো করে' হেসে উঠলো । বললে ঃ উনিই তো পশুরাজ বাবা ! দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই বলে দয়াময় নামটা আমিই রেখেছি ।

দোরে পর্দ্দা-টাঙানো ঘরের ভেতর থেকে সেই লেখক ছোকরার গলার আওয়াজ শোনা গেল ।

—হাসছেন কেন যতীনদা ? ভেতরে আসুন ।

যতীন বললে ঃ যাই । বলেই সে পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো ।

লিখতে লিখতে কলমটা তুলে বিপিন আবার জিজ্ঞাসা করলে ঃ হাসছিলেন কেন ?

এম্‌নিই । বলে যতীন বসলো । হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে বললে ঃ তোমার এই সুন্দর ঘরটিতে বসে বিড়ি টানতে ইচ্ছে করে না । ফেলে দিলাম ।

হ্যাঁ, সিগ্রেট খান।

বিপিন তার ভাল সিগারেটের একটি প্যাকেট তার হাতের কাছে খুলে ধরে বললেঃ নিন্‌।

যতীন বললেঃ সিগ্রেট আমি খাই না ভাই!

বিপিন বললেঃ ভাল লাগে না?

যতীন বললেঃ না। সিগ্রেট কিনে খাবার পয়সা নেই।

এখানে পয়সা লাগবে না—নিন, খান।

একটা সিগারেট বের করে' বিপিন জোর করে' তার হাতে গুঁজে দিতে গেল।

যতীন হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।—লোভ দেখিয়ো না বিপিন! আমি চললাম।

সত্যিই সে চলে যাচ্ছিল। বিপিন তাকে একরকম জোর করেই বসিয়ে দিলে। বললেঃ একটু বসুন। আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে।

যতীন আবার তেমনি হো-হো করে' হেসে উঠলো।—আমাকে ভাল লাগে? জানোয়ারের মত কিম্ভুত-কিমাকার একটা মানুষ, পায়ে জুতো নেই, গায়ে জামা নেই, লোকজন আমাকে দেখে দূরে সরে যায়, কি আছে আমার, যা দেখে তোমার ভাল লাগলো?

বিপিন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে সিগারেট ধরিয়েছিল একটা। বার দুই টেনে ধোঁয়া ছেড়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে বললেঃ আপনার যা আছে, অনেকের তা নেই।

কথাটা শুনে যতীন বলে উঠলোঃ ধেৎ!

বলেই সে চট্‌ করে' বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিপিন তাকে আর কিছুতেই ফেরাতে পারলে না। দোর পর্য্যন্ত উঠে এলো তার পিছু-পিছু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে যতীন বলে গেল, তোমরা সব কাব্যি কর—কবি লেখক মানুষ, তোমাদের ও-সব হেঁয়ালি বুঝতে পারি না ভাই, আমি চললুম।

কখন ফিরবেন ?

সেই এক জবাব !

জানি না।

ব্রজকিশোরবাবু যা বলেছিলেন, তাই হ'লো শেষ পর্য্যন্ত।

কবিরাজী ঔষধালয়, কাপড়কাচার দোকান, আর একটা বিয়ের ঘটকালি করার আপিস—দোতলায় ছিল। তাদেরই উচিত ছিল, সবার আগে নীচে নেমে যাওয়া, কিন্তু কি জানি কেন, তারা কিছুতেই নামতে চাইলে না। বললে, তাদের নাকি বাঁধা মক্কেল আছে, স্থান পরিবর্ত্তন করলে ব্যবসার ক্ষতি হবে।

অথচ জোর করে' তাদের কিছু বলাও চলে না। ব্রজকিশোরবাবু দেখলেন, ভাড়া নেবার সময় তারা রীতিমত ষ্ট্যাম্প-কাগজে লিখিয়ে নিয়েছে। তিন বৎসরের আগে তাদের সরানো চলবে না।

ব্রজকিশোরবাবুর খরচ অবশ্য একটু বাড়লো। ওদিক দিয়ে কাঠের একটা সিঁড়ি তৈরি হ'লো আর বারান্দার দু'দিকে উঠলো দুটো ইটের প্রাচীর। এদিকের সঙ্গে ওদিকের আর কোন সম্পর্ক রইলো না।

দয়াময়ের 'ইম্পিরিয়াল্ বোর্ডিং হাউস' নীচে নেমে গেল।

যতীনের পেতলের ঘটি আর মাদুর নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু যতীন সেই যে গেছে এখনও ফিরে আসেনি। কলকাতা শহর, অন্য কেউ হ'লে ভাবনার কারণ ছিল, কিন্তু যতীন নাকি চিরকালই এম্‌নি। কখন আসে, কখন যায়, কোথায় থাকে, কি করে, কেউ তা জানে না। তবে তার সঙ্গে কারও দেনা-পাওনা গোলমাল

হয়েছে বলে শোনা যায় না। সেদিক্ দিয়ে অত্যন্ত খাঁটি। এক-একদিন সে নিজে বলে, ছোটলোকের সঙ্গে বাস আমি করি বটে, কিন্তু নিজে আমি ছোটলোক নই।

বিপিন একখানি ঘর নিয়ে একাই থাকে। সে-ও তার আসবাব-পত্র নীচে নামিয়ে নিয়ে গেছে। সদর ফটকের পাশের ঘরখানাই ছিল একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাকেই আর একটু ভাল করে' নিজের খরচে মেরামত করিয়ে নিয়েছে বিপিন। মেঝেটা ছিল স্যাঁতসেঁতে। দু'হাত উঁচু করে' ইট গাঁথা হয়েছে মেঝের ওপর। তার ওপর কাঠের পাটাতন। দেওয়ালে দেওয়া হয়েছে সিমেণ্ট-বালির পুরু আস্তরণ। তার ওপর ডিস্টেম্পারের রং। জানলা-দরজা কপাট বসানো হ'লো, নতুন করে'। একেবারে রাজসিক ব্যাপার!

ঘরখানা সাজিয়ে প্রথম যেদিন আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হ'লো, দয়াময় থম্‌কে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে ব্যাপারখানা, তারপর সে এক অদ্ভুত রকমের হাসি হেসে বললে: হ্যাঁ। বাবু যদি কাউকে বলতে হয় তো বিপিনবাবুকেই বলা উচিত। —তা. টাকাগুলো এরকম ভাবে জলে না ফেলে দিয়ে আমাকে যদি দিতেন সার্, তো আপনাকে আমি মাথায় করে' রাখতাম।

জবাব দেবার ইচ্ছে বিপিনের ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন, ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল জবাবটা। বললে: আপনার মাথায় কতটুকুই বা জায়গা, যাঁকে রেখেছেন সেখানে, তিনিই থাকুন, আবার আর-একজনকে সেখানে রাখলে বিভ্রাট বেধে যেতে পারে। তার চেয়ে আমি এইখানেই বেশ ভাল থাকবো মনে হচ্ছে।

টেনিয়া ধোপানী দয়াময়েব মনিব। কথাটা বলা হয়েছিল তাকে লক্ষ্য করেই। কিন্তু ইঙ্গিতটা দয়াময় ধরতে পারলে না। যতীন থাকলে ধরিয়ে দিতে পারতো।

দয়াময় শুধু বললে: আপনারা রাইটার-মানুষ সার, বসে বসে ডে-এণ্ড-নাইট রাইটিং করছেন, আপনাদের সঙ্গে ওয়ার্ডিং-এ কে পারবে বলুন?

বলেই সে তার ক্রাচ্ ঠুকতে ঠুকতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বিপিনের ঘরের পর পাঁচখানি ঘর 'ইম্পিরিয়াল্ বোর্ডিং হাউসে'র। সামনের ঘরখানি অপেক্ষাকৃত ভাল। কাজেই সেটি নিয়েছে দয়াময়। দয়াময়, তার ভ্রাতুষ্পুত্র—বাচ্চু, আর যতীনের ছেঁড়া মাদুর আর পিতলের ঘটিটি। তার পরের দু'খানি ঘর ভাগাভাগি করে' নিয়েছে বোর্ডিংএর আট জন মেম্বার। আট জনের ভেতরে একজন ইস্কুলের পণ্ডিত, বাকি সাত জন কেরাণী। যৌবনের সীমা সকলেই অতিক্রম করেছে। নিজেকে বৃদ্ধ বলতে আপত্তি যদি-বা কারও থাকে, প্রৌঢ় সকলকেই বলা চলে।

বৃদ্ধ গোপালবাবু যে-ঘরে থাকেন, সেই ঘরের সম্মুখে বহুদিনের পুরনো একটা কাঠের সিন্দুক অনেক দিন থেকে পড়ে আছে। সেটা যে কার সে-কথা কেউ জানে না। কাজেই সেটা এখন শুকদেও পাণ্ডীর দখলে। শুকদেও এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা। কাঠ বেচে, কয়লা বেচে, আবার শুনছি ছাগলের দুধ বেচবে বলে সম্প্রতি সে একটি ছাগল কিনেছে। কালো রঙের ছাগল। লম্বা একটি দড়ি দিয়ে সেই সিন্দুকটার একটা পায়ার সঙ্গে ছাগলটিকে সে বেঁধে রাখে।

আপিস থেকে ফেরার পথে, কাগজের ঠোঙ্গায় দু'পয়সার মুড়কি আর এক পয়সার মুড়ি কিনে একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে গুন্‌গুন্ করে' গান গাইতে গাইতে বাসায় ফেরেন বৃদ্ধ গোপালবাবু। তার-পর দোরের কাছে ছেঁড়া মাদুরটির ওপর উবু হয়ে বসে বসে সেইগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে ভক্ষণ করেন। এটি তার প্রতিদিনের অভ্যেস।

সেদিন অপরাহ্নে মনের আনন্দে বসে বসে তিনি মুড়ি-মুড়কি খাচ্ছেন, সুমুখে শুকদেওএর ছাগলটা বাঁধা রয়েছে, শুকদেও একটা কাটারি দিয়ে কাঠ কাটছে একটুখানি দূরে।

ঘরের মেঝের ওপর একটা চট বিছিয়ে হরিশবাবু শুয়েছিলেন। সবাই বলে, এই হরিশবাবুকে কেউ কখনও বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি। আপিস যাবার আগে যতক্ষণ এখানে থাকেন, আবার আপিস থেকে ফিরে এসেই চটের ওপর তিনি গড়িয়ে নেন। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ তিনি মিট্‌মিট্‌ করে' তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন গোপালবাবুকে। দেখলেন—তিনি খেয়েই চলেছেন—খেয়েই চলেছেন। খাওয়া আর শেষ কিছুতেই হয় না। অনেকক্ষণ হরিশবাবু ধৈর্য্য ধরে এই ব্যাপারটি নিরীক্ষণ করলেন শুয়ে শুয়ে। তার পর হঠাৎ এক সময় ধৈর্য্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। শুয়ে থাকা তার হ'লো না। উঠে দাঁড়ালেন। দেয়ালের গায়ে দড়ির আল্‌নায় ঝুলছিল তাঁর আধময়লা জামাটা। তাব পকেট থেকে দুটি পয়সা 'বের করে' গোপালবাবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, গোপালদা' !

—উঁ। মুড়কি চিবোতে চিবোতে গোপালবাবু মুখ ফিরিয়ে তাকালেন সেই দিকে।

হরিশবাবু জিজ্ঞাসা কবলেন : ওই মোড়ের দোকান থেকে আনলেন বুঝি ?

গোপালবাবু বুঝতে পারেননি তাঁর প্রশ্নের অর্থ। বললেন : কি ?

হরিশবাবু বললেন : ওই খাবার ?

গোপালবাবু বললেন : হুঁ।

আমিও আনি। বলে হরিশবাবু বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কিন্তু তক্ষুণি ফিরে এলেন। এলেন খালি হাতে। বোধ হয় দোকান পর্য্যন্ত যাননি। বললেন : আমার মনে ছিল না গোপালদা' আপনার একখানা চিঠি এসেছে। আপনাকে দিতে ভুলে গেছি।

বলেই যে-চটের ওপর তিনি এতক্ষণ শুয়েছিলেন তার তলা থেকে একখানি পোষ্টকার্ড বের করে গোপালদা'র হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরলেন।

গোপালবাবুর খাওয়া তখনও শেষ হয়নি। বললেন : রাখো ওইখানে, নামিয়ে রাখ। চশমা না হ'লে তো পড়তে পারবো না।

হরিশবাবু চিঠিখানি তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে দিলে। দিয়েই আবার তাঁর সেই পরিত্যক্ত চটের ওপর শুয়ে পড়লেন।

গোপালবাবুর মুখে দাঁত এক-রকম নেই বললেই হয়। এবার তাঁর তোবড়ানো গাল দুটো একটু ঘন-ঘন নড়তে লাগলো। খাওয়াটা যেন তাড়াতাড়ি শেষ করতে চান। চিঠির দিকে তাকিয়ে বললেন : আমার ছেলের চিঠি। চিঠি দিতে এত দেরি করে ছেলেটা !

হঠাৎ নজর পড়লো হরিশের দিকে। বললেন : শুয়ে পড়লে যে, মুড়ি-মুড়কি আনলে না ?

হরিশবাবু এবার শুয়েছিলেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। বললেন : নাঃ ! ওগুলো টাট্‌কা নয় দাদা ! তাছাড়া রাস্তার ধারে দোকান তো ! যত রাজ্যের ধূলো পড়ে ওই-সব খাবারের ওপর। নোংরা খাওয়া আর নোংরা থাকা আমার দ্বারা হ'লো না কোনো দিন।

অত সব শোনবার অবসর তখন গোপালবাবুর ছিল না। চিঠি-খানা পড়বার জন্যে তখন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ঠোঙার নীচে কয়েকটি মাত্র মুড়কি তখনও অবশিষ্ট ছিল। সেক'টি তিনি ছাগলটার মুখের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন : খা ব্যাটাচ্ছেলে, খা !

খোট্টা মেড়ুয়ার হাতে পড়ে তো শুকিয়েই মরছিস্ দেখছি, সারাদিন খুটিতে বাঁধা—নে, খা। বলে কাগজের ঠোঙাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গোপালবাবু হাত-মুখ ধোবার জন্যে কলতলার দিকে চলে গেলেন। সিঁড়ির পাশে উঠানের ওপর জলের কল। ধোপাবস্তির দু'জন হিন্দুস্থানী মেয়ে তখন কলে জল ধরছিল। গোপালবাবুর একটু দেরি হ'লো। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখেন, খাবাব লোভে দরজার চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ছাগলটা ঘরের ভেতর ঢুকেছে, গলার দড়িতে টান পড়েছে, তবু সে হাঁটু গেড়ে মুখ বাড়িয়ে অন্ধকাবে কি যেন চিবোচ্ছে।

গোপালবাবুদেব ঘরে আলো খুব কমই প্রবেশ করে। বাইরে থেকে এসে ঘরের ভেতর চট্ করে' ভাল নজব হয় না। হেট্ হেট্ বলে ছাগলটাকে একটু সরিয়ে দিয়ে গোপালবাবু হাতড়ে হাতড়ে তাঁর বিছানার তলা থেকে সাদা নিকেলের চশমাটি বের কবে' চোখে পরলেন। তাবপর চিঠির সন্ধান করতে গিয়ে মাথায় তাঁর আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। দেখলেন, চিঠিখানা ছাগলের মুখে। সে সেটা তখন চিবোচ্ছে। বেয়াদব ছাগলটার মুখ থেকে চিঠিখানা টেনে বের কববার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সবটা পেলেন না। একটুখানি টুক্রো মাত্র ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো। বাকি চিঠিখানা তখন সে গিলে ফেলেছে। এতদিন পবে ছেলের কাছ থেকে চিঠিখানা যদি-বা এলো, তাও আবার হতভাগা ছাগল দিলে খেয়ে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধ গোপাল-বাবু তার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললেন। নিজের দন্তহীন মাড়ি দিয়ে জিবটা চেপে ধবে সে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে ছাগলটাব পেটের ওপর মারলেন তিনি এক প্রচণ্ড লাথি। যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে মোচড় খেতে খেতে অত-বড় ছাগলটা দোরের বাইবে গিয়ে পড়লো। ছাগলটা বোধ করি ছিল পূর্ণগর্ভা। নইলে এতটা কষ্ট বোধ করি তার হ'তো না। ঠিক মানুষের মত সে কি তার কান্না!

ধড়মড় করে' হরিশবাবু উঠে পড়লেন। কাঠ কাটা ফেলে দিয়ে শুকদেও ছুটে এলো। দু'জন কেরাণী বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে। বাচ্চু বেরিয়ে এলো। বিপিন এলো ছুটতে ছুটতে। এম্‌নি আরও কয়েকজন লোকের চোখের সুমুখে ছাগলটা কাতরাতে লাগলো। পেছনের দুটো পা টেনে একবার গুটিয়ে নিলে পেটের কাছে, তারপর দেখতে দেখতে পা'গুলো ছড়িয়ে দিয়ে চোখ দুটো দিলে উল্‌টে। পেটটা ফুলে উঠলো, কাণ দুটো একবার নড়লো, তার পর মিনিট খানেকের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

শুকদেও এতক্ষণ তাব পরিচর্য্যায় ব্যস্ত ছিল। এবার যখন আর কোনও আশাই রইল না, তখন সে ঝুঁকে পড়লো ছাগলটার ওপর। দু'চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে' জল গড়িয়ে এলো। ছাগলটার কাণের ভেতর ফুঁ দিতে দিতে বলে উঠলো ঃ

—ই কা কিয়ে হেঁ বাবুজি !

মনে মনে একটুখানি ভয় যে গোপালবাবুর না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু চিঠির শোক তখনও তিনি ভুলতে পাবেননি, রাগও পড়েনি। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন ঃ এতক্ষণে বাবুজি !

ব্যাটাচ্ছেলের চোদ্দপুরুষের বাবুজি আমি !

লোকজনের গোলমাল শুনে দূরের গর্ত্ত থেকে জন-দুই বলিষ্ঠ বেশ জোয়ান হিন্দুস্থানী এসে দাঁড়ালো। বললে ঃ কা হুয়া হ্যায় হো ?

এই একরোকা বদমেজাজী লোকগুলো একবার যদি রাগে তো করতে পারে না এ-হেন কাজ নেই—গোপালবাবু তা' জানেন। আর জানেন বলেই কোঁৎ করে' একটা ঢোক্ গিলে ব্যাপারটা আগে-ভাগে তাঁদের বুঝিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন। বললেন ঃ কেয়া হুয়া ? হামারকা আস্ত একখানা চিঠি—পোষ্টকার্ডকা চিঠি—গিল্‌কে মার্ দিয়া। আউর কেয়া হোগা ?

তাঁর এই ভাষা তারা বুঝলো কিনা কে জানে, তাদের মধ্যে একজন কিন্তু বেশ চোখ পাকিয়েই এগিয়ে এলো।

—ইস্‌কা জিউ মারা হ্যায় কাহে তুম্ পহিলা তো বাতাও!

আর একজন তার সুরে সুর মিলিয়ে দিলে।

—হাঁ, কেঁউ মার্ ডালা—বাতাও!

ব্যাপারটা ভাল বলে মনে হ'লো না গোপালবাবুর।

পিছু হাঁটলেন।

কথাটার জবাব না দিয়ে এম্‌নি ভাবে তিনি তাঁর অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়লেন—মনে হ'লো যেন কথাটা তিনি শুনতেই পাননি।

কিন্তু শুনেছেন সবই।

গর্ত্তের ভেতর থেকে জবাবের তুবড়ি ছুটতে লাগলো।

—মার ঢেলা? মার ঢেলা তো কেয়া হোগা? হামারকা ঘরকা চিঠি—ও-ব্যাটা চিবায় চিবায়কে খা দেগা, আর আমি শালা উস্‌কো কোলে করকে চুমো খায়েগা—না?

এই বলে উঁকি মেরে একবার বাইরেটা দেখে নিলেন।

নিয়ে আবার বলতে লাগলেন: আসুন বিপিনবাবু, আসুন, ভেতরে আসুন। বলি ওহে মিত্তির, ঘরের ভেতর চলে এসো না! চলে আসুন সব ঘরের ভেতর—ওরা সব করতে পারে। চোখ রাঙ্গায়কে কথা বোলেঙ্গা। তোদের চোখ রাঙানীর কি ধার ধারি র‍্যা? চলে আসুন সব। ওদের ও হাঙ্গামায় থাকবেন না মশাই!

গোলমাল ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। ধোবী মহল্লা থেকে দু-চারটে মেয়ে যেন সিঁড়ির ওপার থেকে উঁকি মারছে মনে হ'লো।

বিপিন এগিয়ে গেল শুকদেও-এর কাছে। জিজ্ঞাসা করলে:

—তোমার ও ছাগলের কত দাম ছিল শুকদেও?

শুকদেও তখনও ছাগলটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। জিহ্বা ও

তালুর সংঘর্ষে একরকম শব্দ বের করে' ঘাড় নাড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বললে : নেহি বাবুজি, নেহি। রোপিয়া কেয়া হোগা ? রোপিয়ামে ক্যা হামারা বুধিয়াকো জিয়ান্ সকেগা ?

বলেই একটুখানি থেমে, উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ কিছুটা মন্দীভূত করে' নিয়ে সে আবার বললে : উহি বুড্ঢা বাম্হন্কা হাঁতমে ইন্কা জান্ থা বাবুজি—চলা গয়া। মেরা নসিব।

জলভারাক্রান্ত চোখ দু'টি তুলে সে একবার তার কপালে করাঘাত করে' উঠে দাঁড়ালো। ঘরের ভেতর থেকে একটি জলের ঘটি আর ওদিকের প্রাচীরের নীচে আগাছার জঙ্গল থেকে কয়েকটি কচি কচি ঘাস ছিঁড়ে এনে মরা ছাগলটার মুখের কাছে ধরে দিলে।

মরা গরু-ছাগলের শেষকৃত্য নাকি এম্নি করেই করতে হয়।

তারপর কাউকে কোনও কথা না বলে ছাগলটাকে আড়কোলা করে' তুলে নিয়ে শুকদেও চলে গেল।

ব্যাপারটা যে এত শীঘ্র এমন করে' মিটে যাবে—কেউ তা ভাবতে পারেনি।

গোপালবাবু বিপিনকে কিছুতেই ছাড়লেন না।

বিপিন চলে যাচ্ছিল, গোপালবাবু তাকে জোর করে' টেনে ঘরে ঢুকিয়ে বললেন : বসুন।

বিপিন বললে : আমাকে 'বসুন' বলছেন কেন গোপালবাবু ? আমি আপনার নাতির বয়সী।

গোপালবাবুর তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। তিনি এখন আর ও-সব কথা শুনতে চান না। এখন তিনি শোনাতে চান তাঁর চিঠির কথা। শোনাতে চান—অর্ব্বাচীন ছাগলটার অপরাধের কথা।

অনেক কথাই তিনি গড় গড় করে' বলে গেলেন। সে-সব অনেক কথা। বিপিন যা শুনে তার সারমর্ম্ম এই :

তাঁদের গ্রামে দু'জন দুর্দ্দান্ত জমিদারের বাস। দুই সহোদর ভাই। দু'ভাই যখন পৃথক্ হয়েছে, জমিদারীটাও দু'ভাগে ভাগ করে' নিয়েছে। উত্তর পাড় পড়েছে বড়বাবুর সেরেস্তায়, আর দক্ষিণ পাড় ছোটবাবুর।

এই দুই ভাই-এর মত-বিরোধ মনোমালিন্যের অন্ত নেই। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে।

তার সঙ্গে সঙ্গে প্রজারা পড়েছে মহা বিপদে। তাদের মনেও সুখ নেই। দক্ষিণ পাড়ার প্রজাদের সঙ্গে উত্তর পাড়ার প্রজাদের ঝগড়াঝাঁটি না থাকলেও, ঝগড়া বিসম্বাদ একটা তৈরি করে নিতে হচ্ছে।

গোপালবাবুর বাড়ী উত্তর পাড়ায়। কাজেই তিনি পড়েছেন বড়বাবুর ভাগে।

গত চৈত্র মাসে ছিল বাসন্তী পূজো। বড়বাবু বিস্তর টাকা খরচ করলেন। ভাটপাড়া থেকে পণ্ডিত এলেন। বিশুদ্ধ শাস্ত্রমতে খুব ধুমধাম করে পূজো হ'লো। কলকাতা থেকে এলো বাই-নাচ। শান্তিপুর থেকে এলো যাত্রার দল। গ্রামের ভেতর একটা হুলস্থুল পড়ে গেল।

কিন্তু সব চেয়ে মজা হলো এই যে, জমিদারবাবু খেয়ালের মাথায় হুকুম দিয়ে ফেললেন—উত্তর পাড়ার এই মহোৎসবে দক্ষিণ পাড়ার লোকের আসা নিষেধ।

এই কথা না শুনে ছোটবাবু তো চটে লাল!

তাঁরও আর চুপ করে বসে থাকা চললো না।

তিনি বললেন, লাগাও।

লাগাও তো লাগাও। লেগে গেল এলাহি কাণ্ডকারখানা!

দক্ষিণ পাড়ার সীমানায় প্রথমে বড় বড় তোরণ তৈরি হ'লো।

জমিদার-বাড়ীর সদরে যে ফাঁকা চত্বর পড়েছিল সেইখানে উঠলো প্রকাণ্ড বাড়ী। কলকাতা থেকে প্রথমে এলো মস্ত বড় নামজাদা থিয়েটার। তারপর এলো টকি সিনেমা।

থিয়েটার সিনেমা দেখতে পয়সা লাগবে না।

কলকাতার থিয়েটার সিনেমা বাপ-জন্মে কখনও দেখেনি, কখনও দেখবার আশা-ভরসাও নেই—এরকম লোকের সংখ্যা গ্রামে কম নয়। তার ওপর কারও কোনও বাধা নিষেধ রইলো না। দক্ষিণ পাড়ার লোকজন তো দেখবেই, উত্তর পাড়ার লোকজন যদি আসে মহা সমাদর করে তাদের বসিয়ে দেওয়া হবে।

এদিকে বড়বাবুর হুকুম—দক্ষিণ পাড়ায় কেউ যাবে না। যে যাবে তার ওপর চলবে অত্যাচার।

উত্তর পাড়ার লোকেরা মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

বাইরে বাইরে বড়বাবুকে সেলাম বাজাতে লাগলো, কিন্তু মনে মনে চটে গেল বড়বাবুর ওপর।

ছোট বাবুর জয়জয়কার।

উত্তর পাড়ার লোক লুকিয়ে লুকিয়ে থিয়েটার সিনেমা দেখতে লাগলো। কিন্তু ধরা পড়লেই বিপদ।

ধরা যে দু-চার জন পড়লো না তা নয়। তবে অপরাধটা এমন-কিছু গুরুতর নয় বলে বড়বাবু দু-চারটে ধমক দিয়েই ছেড়ে দিলেন।

বড়বাবু বললেন, থিয়েটার সিনেমার লোভ দেখিয়ে লোক ভাঙ্গানো এমন-কিছু বড় কাজ নয়। আর কিছু যদি করতে পারে তো জানি—বাপের ব্যাটা!

অথচ দু'জনে সহোদর ভাই!

ছোটবাবুর কানে কথাটা গিয়ে পৌঁছালো।

তিনি তখন ভারি এক মজার ব্যাপার করে বসলেন।

বড়বাবু গোঁড়া ব্রাহ্মণ, আর ছোটবাবু কলকাতা থেকে বি-এ পাশ করে এসেছেন। একটুখানি আপ-টু-ডেট। গোঁড়ামির ধার ধারেন না।

তিনি আয়োজন করে' বসলেন বিরাট ভোজের।

উত্তমরূপ ভুরিভোজনের পর প্রত্যেককে দক্ষিণা দেওয়া হবে এক টাকা। দক্ষিণ পাড়া তো খাবেই, উত্তর পাড়ার যে আসবে সে-ই খেতে পাবে, দক্ষিণাও পাবে। তবে একটা ব্যাপার আছে। সেখানে কোনো রকমের জাতিভেদ বলে কিছু থাকবে না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র—সবাই বসে যাবে পংক্তি-ভোজনে। তা যদি না বসে তো খেতেও পাবে না, দক্ষিণাও পাবে না।

সর্ব্বনাশ!

একে খাবার লোভ, তার ওপর টাকা।

লুকিয়ে লুকিয়ে যে খেয়ে আসবে তারও উপায় নেই।

ছোটবাবু ফটকের মুখে খাতা-কলম দিয়ে লোক রাখলেন। নাম-ধাম সব লিখে রাখবে।

ব্রাহ্মণেরা একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

বড়বাবু মহা খুশী। দক্ষিণ পাড়ায় কেউ গেল না।

ছোটবাবু প্রচার করলেন—ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়া হবে পাঁচ টাকা। গোপনে খেয়ে গেলেও চলবে। নাম-ধাম লিখে রাখা হবে, কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ করা হবে না।

এটা যে ছোটবাবুর চাল—প্রথমে তা কেউ বুঝতে পারলে না।

রাত্রির অন্ধকারে দক্ষিণ পাড়া থেকে দশজন মাত্র লোক গেল উত্তর পাড়ায়।

তারা ভেবেছিল এ-কথা কেউ জানবে না। কিন্তু তার পরের দিন

সকালে ঢোল সহরৎ করে সারা গ্রামে এই আনন্দ-সংবাদটা প্রচার করে দেওয়া হলো।

এই দশ জনের ভেতর ছিল গোপালবাবুর বড় ছেলে।

অথচ এই ছেলেটার যাবতীয় পড়ার খরচ দেন বড়বাবু। ছেলেটা ম্যাট্রিক পাস করে আই-এ পড়ছে।

গোপালবাবু তখন এই 'ইম্পিরিয়াল্ বোর্ডিং হাউসে'। এ ব্যাপারের কিছুই জানতেন না।

জানলেন তখন—যখন বড়বাবু দিলেন ছেলেটার সব খরচ বন্ধ করে।

ছোটবাবু অবশ্য তার পড়ার খরচ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাহ'লে তাঁকে পৈতৃক ভিটে পরিত্যাগ করে' উত্তর পাড়া ছেড়ে দক্ষিণ পাড়ায় গিয়ে বসবাস করতে হয়!

দক্ষিণ পাড়ায় ছোট বাবু তাঁর একটা ঘর-বাড়ী করে' দিতেও রাজি।

কিন্তু হাজার হোক্, পৈতৃক ভিটে!

গোপালবাবু তাঁর পৈতৃক ভিটে পরিত্যাগ করতে রাজি ন'ন। তার ওপর ম্লেচ্ছের মতন এই সব জাতিভেদ ঘুচিয়ে দেওয়াও তিনি পছন্দ করেন না।

নিষ্ঠাবান্ পবিত্র তিনি। এই সব অপবিত্র ব্যাপার তাঁর সহ্য হবে না বলেই গোপালবাবু তিন দিনের ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলেন। বড়বাবুব হাতে-পায়ে ধরে' তাঁকে রাজি করিয়ে এসেছেন। ছেলেটা যদি প্রায়শ্চিত্ত করে' নাকখৎ দেয় তাহ'লে বড়বাবু তাকে ক্ষমা করবেন। খরচপত্র যেমন দিচ্ছিলেন আবার তেমনি দিতে থাকবেন।

ছেলেটা প্রায়শ্চিত্ত করে' গ্রামের সকলের সুমুখে নাকখৎ দিয়ে জাতে উঠলো কি না, বড়বাবু তাকে ক্ষমা করলেন কি না—এই সব

কথা জানিয়ে ছেলেটাকে তিনি চিঠি দেবার জন্যে বারংবার অনুরোধ করে' এসেছিলেন।

এই যে চিঠি—যে-চিঠি ওই ছাগলটা খেয়ে ফেললে—এ তার সেই ছেলের চিঠি।

সুতরাং—

গোপালবাবু বললেন, এখন বিচার করে' দিন বিপিনবাবু—দোষটা কার বেশী। ওই ছাগলটার, না তাঁর ?

এই বলে গোপালবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বিপিনের কাছেই হাত পেতে বসলো, দাও একটা বিড়ি দাও, খাই। সেই থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখটা খারাপ হয়ে গেল।

বিপিন বাধ্য হয়েই তাঁর কথা শুনছিল, বাধ্য হয়েই পকেট থেকে সিগারেট বের করে' গোপালবাবুর হাতে দিয়ে বললে, নিন্।

গোপালবাবুর কাছে দেশলাইও ছিল না! বিপিন দেশলাই জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিলে। এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে দেখলে, লোকজন সব চলে গেছে। হরিশবাবু মেঝের ওপর শুয়ে শুয়ে পরমানন্দে নাক ডাকাচ্ছেন।

বিপিন বললে, উঠি।

বলেই সে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

গোপালবাবু বললেন, উঠবেন কেন, বলে যান।

পরে বলবো। বলেই বিপিন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

কিন্তু গোপালবাবু তাকে হাঁফ ছাড়তে দেবেন কেন ?

লোকজন যখন চলেই গেছে তখন ঘরের বাইরে আসতে দোষ কি ? সিগারেট টানতে টানতে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

বিপিনের একখানা হাত চেপে ধরে বললেন : শুনুন। না, আপনাকে আর শুনুন বলবো না—শোনোই বলি। শোনো !

বলেই এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে গলার আওয়াজটা একটু খাটো করে' বললেন : আমি অত্যন্ত নিরীহ ব্রাহ্মণ, তাই একটা লাথি মেরে ছেড়ে দিয়েছি। হ'তো আমাদের যতীন তো ছাগলটাকে তক্ষুণি কেটে একেবারে খণ্ড খণ্ড করে' দিয়ে ওর পেট থেকে চিঠিটা বের করে' নিতো।

যতীনের কথা উঠতেই বিপিন জিজ্ঞাসা করলে : যতীনবাবু কোথায় যান বলতে পারেন ? সেই যে গেছেন, এখনও এলেন না।

গোপালবাবু বললেন : কি জানি ভাই জানি না। ও-সব দয়াময় বলতে পারে। যতীন ওর দেশের লোক।

বিপিন সেখান থেকে পালাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিল। বললে, আমি যাই। ঘরটা বন্ধ করে' আসিনি।

গোপালবাবু বললেন : যাও। কিন্তু ভাল করে' ভেবে দেখো। তুমি ছোকরা ভালো তাই তোমাকেই বললাম কথাটা, নইলে ওই ওকে বলিনি কেন ?

আঙুল বাড়িয়ে ঘরের মধ্যে শায়িত হরিশবাবুকে তিনি দেখিয়ে দিলেন।

বললেন : দিবা-রাত্তির শুধু ঘুম আর ঘুম ! এই যে এই এত বড় ব্যাপারটা ঘটে গেল, উঠে একবার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ? আমার হয়ে দুটো কথা বলেছে ? অথচ এক-ঘরে পাশাপাশি বাস করি, এক-আধটা বিড়ি-টিড়ি চাইলে দিই, কত যে ওর উপকার করি তা একমাত্র আমিই জানি। আমি ভাই কারও অনিষ্ট কোনো দিন করি না, কারও কিছুতে থাকি না—তা সে আমাকে যে যাই বলুক।

শুকদেও-এর ভাই ভূখন এলো। মাণিকতলায় একটা তেলের

কলে কাজ করে, সকালে ছাতু-লঙ্কা খেয়ে কাজে বের হয়, সারাটা দিনের পর, প্রতিদিন ঠিক এই সন্ধ্যার মুখে মাণিকতলা থেকে হাঁটতে হাঁটতে তাদের এই অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে ফিরে আসে।

ভূখনের হাতে ছিল একটা অশ্বত্থের ডাল। পথের ধারে কোথায় কোন্ গাছ থেকে ভেঙে এনেছিল ছাগলটা খাবে বলে। এসেই শুনলে—বুধিয়া মরে গেছে। কচি পাতায় ভরা অশ্বত্থের ডালটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। বললে : সে কি? কখন?

বুধিয়া কেমন করে মরেছে শুকদেও সব বললে তাকে। ভূখন শুকদেও-এর সহোদর ভাই, কিন্তু তার প্রকৃতি একটু অন্যরকম। অতি সামান্য কারণেই গায়ের রক্ত তার চট্ করে' মাথায় উঠে যায়। চোখ দুটো হয় লাল। রাগে হাত-পা থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে।

ভূখন কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর শুকদেওকে যা বললে তার সোজা মানে হলো এই যে, চল তুমি একবার সেই লোকটাকে দেখিয়ে দাও গে, আমি তারও পেটে গোটাকতক লাথি মারি।

ভূখনটা বদ্‌রাগী। সত্যিই হয়তো সে একটা বিশ্রী ব্যাপার করে' তুলতো, কিন্তু শুকদেও তাকে ভাল করে বুঝিয়ে বললে—দৈবাৎ যে-কাজ হয়ে গেছে, তার জন্যে হট্ করে' মানুষের এত সহজে মাথা গরম করা ঠিক নয়।

এই বলে সে তার দিনের রাঁধা ভাতগুলো হাঁড়ি থেকে বের করে কানা-উঁচু দুটো পেতলের থালায় বেড়ে নিয়ে বললে : মাথা ঠাণ্ডা করে' নে বোস, বসে খা। সারাদিন খাসনি।

ভূখনের ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। ভাতগুলো চোখের সামনে দেখে আস্ফালনটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। দুই ভাইয়ে পাশাপাশি খেতে বসলো।

শুকদেওকে আলো জ্বালতে হয় না। রাস্তার একটা গ্যাসের আলো তার এই গর্ত্তের মধ্যে এমন ভাবে এসে পড়ে যে, দিনের চেয়ে রাত্রেই তারা ঘরের প্রতিটি জিনিস বেশ ভাল করে দেখতে পায়।

সারাদিনের পর পেটে ভাত পড়তেই ভূখনের মুখের চেহারা গেল পাল্‌টে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা বলতে লাগলো। বললে, আজই আমি আর-একটা ,বকরি' আনতে পারি ভেইয়া। বুধিয়ার চেয়ে বড়। ছোট ছোট দুটি বাচ্চাও আছে সঙ্গে।

শুকদেও বললে, থাক আর বকরি এনে কাজ নেই। তার চেয়ে গাই যদি একটা আনতে পারিস তো বরং ছাখ চেষ্টা করে' ; দুধ বেচে লখিয়া বড়লোক হয়ে গেল।

আর একটা কি কথা যেন ভূখন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শুকদেও-এর মুখের পানে তাকিয়ে বলতে সাহস হ'লো না। হেঁটমুখে বসে বসে খেতে লাগলো।

সুমুখের বস্তিতে শুকদেও-এর এক 'দোস্ত' থাকে। নাম হরদয়াল। সওদাগরী আপিসের সাইকেল-পিওন।

এই লোকটির সঙ্গে শুকদেও-এর ভাব-ভালবাসা অনেক দিনের। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রায় প্রতি রাত্রেই শুকদেও এই হরদয়ালের ঘরে গিয়ে বসে, কত সুখ-দুঃখের কথা হয়, 'খইনি' খায়, গাওনা চলে, তারপর অনেক রাত্রে বস্তি যখন নিঝুম হয়ে আসে, তখন শুকদেও তার আস্তানায় ফিরে আসে।

সেদিন ভূখনকে পেয়ে শুকদেও হরদয়ালের ঘরে আর গেল না। খড়-বাঁধা গদির ওপর চটের বিছানা পেতে পাশাপাশি শুয়ে পড়লো দু'ভাই।

যে-কথাটা ভূখন তার দাদাকে বলবে ভেবেও তখন বলতে পারেনি, সেকথাটি অনেক দিনের। অনেক দিন থেকেই বলবো বলবো করছে কিন্তু বলবার একটা 'মওকা' চাই তো ?

ভূখন সারাদিন বাড়ী থাকে না। এখানে যখন ফিরে আসে, শুকদেও থাকে তার বন্ধু হরদয়ালের কাছে। অনেক রাত্রে যখন সে ফিরে আসে শ্রমক্লান্ত ভূখন তখন ঘুমিয়ে পড়ে, বুঝতেও পারে না— দাদা কখন ফিরেছে। পরদিন সকালে উঠেই কাজে চলে যায়। কথাটা বলা আর হয় না।

আজই ভাল সুযোগ। কথাটা সে বলবেই।

ভূখন ডাকলে : জাগল্ হো ভাইয়া ?

হুঁ।—শুকদেও চোখ খুলে তাকালে।

ভূখন কেমন ক'রে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারলে না। সোজাসুজি কথাটা না বলে বোধ হয় একটু ঘুরিয়ে বললে। বললে —গাই-এর কথা তখন বলছিলে তুমি। যে-সে গাই নয়, একেবারে ভাগলপুরী গাই—ভেইয়া যদি বলে তো কালই সে তাকে এনে দিতে পারে।

শুকদেও কেমন যেন অবাক্ হয়ে গিয়ে ভূখনের দিকে চেয়ে রইলো। ভূখন বলে কি ? তখন সে একটা ছাগল আনবার কথা বলেছিল। এখন বলছে—ভাগলপুরী গাই এনে দিতে পারে।

ভূখন কাজ করতো ঝাঁকা-মুটেব। বছর-খানেক হলো তেলের কলে কাজ করছে। এরই মধ্যে সে এত বড়লোক হ'লো কেমন করে' ? ভাগলপুরের গাই-এর দাম তো কম নয় !

তেলের কলে কাজ সে নিজেও করেছে। রোজগার যে কত সেকথা তার অজানা নেই। শুকদেও আর ভূখন দু'ভাই প্রথমে

ঝাঁকা-মুটের কাজ করবার জন্যেই কলকাতায় আসে। ঝাঁকা বইতো সারাদিন। থাকবার জায়গা ছিল না। কতদিন শুধু ছাতু খেয়ে দিন কাটিয়ে, রাতের পর রাত তারা কাটিয়ে দিয়েছে বড়লোকের বাড়ীর রকে, ফুটপাতের ধারে। দেহের কষ্টকে কষ্ট ভাবেনি। কোনো রকমে কিছু রোজগার, কোনো রকমে দিন গুজরান। কতদিন কত বাবু মেরেছে জুতোর ঠোক্কর। কতদিন কত সেপাই মেরেছে রুলের গুঁতো।

তারপর তারা দুজনেই গিয়েছিল তেলের কলে কাজ করতে। পরিশ্রম সেখানে কিছু কম। রোজগারও কিছু বেশী। কিন্তু মানুষের সম্মান সেখানেও দেয় না কেউ। রাস্তার একটা কুকুরও যা, সেও তাই।

এমন দিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। দেখা হ'লো হরদয়ালের সঙ্গে। ছেলেবেলার বন্ধু হরদয়াল।

হরদয়াল তাকে নিয়ে এলো ভবানীপুরে। ভুখন রইলো তেলের কলে, আর সে এলো হরদয়ালের বস্তিতে। হরদয়ালই দিলে পুঁজি, হরদয়ালই দিলে উপদেশ। বাড়ী বাড়ী ডাল বিক্রি করার কারবার। স্বাধীন কারবার। লাভও ভাল।

হরদয়াল তার স্ত্রীকে নিয়ে এলো দেশ থেকে। শুকদেও তখন ঘর ভাড়া নিলে এইখানে। ঘর ঠিক বলা চলে না। ব্রজকিশোরবাবুর সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর নীচের তলার একটি গুহার মত অন্ধকার গহ্বর। ভাড়া মাসে দু' টাকা। বাড়ীর সুমুখে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। আগাছার জঙ্গলে ভরা। সিঁড়ির নীচে চোর-কুঠুরি। এ সবই এখন তারই দখলে। ভেবেছিল, ভুখনকে এখানে এনে তাকে দেবে ডালের ব্যবসা আর সে নিজে করবে কাঠ-কয়লার কারবার।

ভূখন এলো কিন্তু ডালের কারবার সে করতে চাইলে না। বললে : টাকা পয়সার হিসেব আমি রাখতে পারবো না ভাইয়া। সব কিছু গোলমাল হ'য়ে যাবে। কারবারে ঘাট্‌তি পড়বে। তার চেয়ে তেল-কলে আমি বেশ আছি।

শুকদেও তখন কাঠ-কয়লা কিনে ফেলেছে।

সেই থেকে কাঠ-কয়লার কারবার তার ভালই চলছে। ভূখন কাজ করেছে তেলের কলে। ভবানীপুর থেকে মাণিকতলা, মাণিকতলা থেকে ভবানীপুর।

কিন্তু ভূখন বলে কি? কলে কাজ করে' এত পয়সা সে জমালো যে গাই বক্‌রি কিনতে পারবে? তার ওপর যে-সে গাই নয়, ভাগলপুরী গাই?

শুকদেও খুশী হ'লো, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলে না তাকে। জিজ্ঞাসা করলে : গাই কেমন করে আনবি? পাবি কোথায়?

ভূখন বললে : আছে এক জায়গায়। আমি পারি আনতে।

আর কিছু সে বললে না। না বলে পাশ ফিরে শুলো।

শুকদেও বললে : কত টাকা দিতে হবে?

ভূখন সেদিকে মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলে : এক পয়সা না।

শুকদেও হাসলো মনে মনে। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা ভেবে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তেল-কল ভাল জায়গা নয়! দেহে শক্তি আছে। ওইটুকুই তাদের একমাত্র মূলধন। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অনেককে দেখেছে সে—এই মূলধন তারা খাটিয়েছে অন্য দিকে। গুণ্ডামি করেছে। চুরি করেছে। রাত্রির অন্ধকারে নিরীহ পথচারীর যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। শেষে ধরা পড়েছে। মার খেয়েছে। জেল খেটেছে। সারা জীবনটাই গেছে বরবাদ হ'য়ে।

শুকদেও শিউরে উঠলো।

এ-ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই ভূখন কারও গাই-বাছুর চুরি করে' আনতে চায়।

তা যদি হয় তো ভূখনকে মেরে খুন করে' ফেলবে। না পারে, নিজে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। তাদের বংশে কেউ কখনও চুরি করেনি। গরীব তারা, খেটে খায়, কিন্তু চোর নয়।

ভূখন বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুকদেও-এর চোখে ঘুম নেই! ঘুম তার কিছুতেই আসছে না। তার ভাই যদি চোর হয় আর তাকে যদি সে সে-পথ থেকে ফেরাতে না পারে, তাহ'লে এ-জীবন সে রাখবে না।

ডাকি ডাকি করেও ভূখনকে সে ডাকতে পারলে না। সারাটা রাত এক রকম সে জাগিয়েই কাটিয়ে দিলে!

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরের দিন ঘুম যখন তার ভাঙ্গলো তখন রোদ উঠে গেছে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে তাদের ঘুম ভাঙ্গে। ভূখন ঠিক সময়েই উঠেছে। উনুন ধরিয়ে স্নান করে জল এনে আটা মাখতে বসেছে।

শুকদেও দেরীতে উঠলো দেখে ভূখন জিজ্ঞাসা করলে, তবিয়ৎ কি তোমার ভাল মনে হচ্ছে না?

শুকদেও বললে: না। তবিয়ৎ ঠিক আছে, তবে মেজাজ থোড়া বিগড়েছে। আসছি।

এই বলে সে কলে চলে গেল।

কোনো রকমে তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে এসে সে বসলো।

ভূখন জিজ্ঞাসা করলে: স্নান করে' এলে না?

শুকদেও বললে: আমার মেজাজ বিগড়েছে, আর তোর কি মাথা বিগড়েছে নাকি?

কথা বলবার ধরণটা কেমন যেন অন্য রকম।

ভূখন বললে : কেন ?

শুকদেও বললে : দেরীতে ঘুম ভাঙ্গলে এখানকার কল পাওয়া যায় না—জানিস না ?

সত্যিই তো ! ভূখন চুপ করে' রইলো।

শুকদেও বললে : একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। সত্যি বলবি তো ?

ভূখন অবাক হয়ে তার দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। দাদা বলে কি ? জীবনে সে কখনও তার দাদাকে মিথ্যা কথা বলেনি। সে কথা কি ভেইয়া জানে না ? বললে : বল কি বলবে ?

শুকদেও বললে : বদ্‌লোকের সঙ্গে মিশছিস্ তুই।

ভূখন বললে : কখ্‌খনো না।

শুকদেও বললে : আলবাৎ !

একটুতেও ভূখনের রাগ হয়ে যায়। বললে : না-না-না-না।

শুকদেও বললে : 'না' বললেই আমি শুনবো ?

শুনবে না ? আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না ?

খুব বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন আর করি না !

কিন্তু কেন ? কি করেছি আমি সেই কথা বল।

কিছু বলতে হবে না। আমি তোর মুখ দেখে সব বুঝতে পারি।

কাল যখন এলাম, কই, তখন তো কিছু বললে না ?

শুকদেও চুপ করে' রইলো।

এরই মধ্যে কি এমন ব্যাপার হলো ? কেউ কিছু তোমাকে বলেছে আমার নামে ? বল—বল !

শুকদেও বোধ হয় ভাবছিল—কি বলবে।

ভূখন বললে : না বললে ভাল কাজ হবে না কিন্তু।

এতক্ষণে শুকদেও মুখ খুললে। বললে: চোর হয়েছিস তুই।

চোর? আমি?

শুকদেও বললে: জরুর। নইলে ভাগলপুরী গাই তুই কোথায় পাবি? বলে কিনা—একটা পয়সা লাগবে না। পয়সা না দিয়ে জিনিস পাওয়া যায় কোথায়? কারও গাই তুই চুরি করে আনবি!

এই কথা? এই জন্যে তোমার এত রাগ?

হ্যাঁ।

ভূখন বললে: তবে শোনো!

ভূখনের মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল। যে-কথাটা দাদাকে বলবার জন্যে সে কাল থেকে ছট্‌ছট্‌ করছে, সেই কথা দাদা তার নিজেই জানতে চাইলে। রুটি গড়া এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার সে হাত দিয়ে রুটি তৈরি করতে করতে যা বললে তা এই:

তেলের কল যেখানে তার পাশেই সরু একটা গলি। সেই গলিব ভেতর ঢুকেই বাঁ হাতে তিনখানা বাড়ীর পরেই টালির ছাত যে ঘরটার, সেই ঘরে থাকে একটি মেয়ে। নাম সখিয়া। বয়স হবে আঠারো কি উনিশ। আরা জেলায় বাড়ী। তাদেবই স্বজাতি। সখিয়া যখন খুব ছোট তখন তার মা মারা গেছে। বুড়ো বাপের ছিল ছোট খাটো একটি পুরানো লোহার দোকান। এক বছর আগে বাপও হঠাৎ মরে গেল। মেয়েটি একা। দেখতে খুব সুন্দরী, তার ওপর ছেলে মানুষ। দুষ্টু লোক পেছনে লাগলো। দোকানটা সবাই মিলে লুটেপুটে দিলে নষ্ট করে। এখন থাকবার মধ্যে আছে তার অনেকগুলো সোনা-রূপোর গয়না, একটি বক্‌রি, একটি গাই আর একটি বাছুর। অনেক দিনের পুরনো একজন ঝি তাকে দেখাশোনা

করে। তার বাড়ীতেই থাকে। এখন শুকদেও যদি অনুমতি দেয় তো গাই-বক্‌রি আর জিনিসপত্র সমেত সখিয়াকে সে এখানে এনে রাখতে পারে।

শুকদেও-এর মাথাটা চন্‌ করে' ঘুরে গেল।

ভূখন—তার ভাই, দেখতে সুপুরুষ, বলিষ্ঠ জোয়ান, গায়ের রং ফরসা, কিন্তু নিতান্ত গরীব এক তেল-কলের কুলি ছাড়া আর কিছু নয়। আর ওদিকে যে-মেয়েটির কথা বলছে সে, ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আজ না হয় সে বিপন্না, দেখাশোনা করবার লোক নেই, কিন্তু তাই বলে এখানে এসে থাকবে সে কোন্‌ সুবাদে? ভূখনের সঙ্গে তার পরিচয়ই-বা হ'লো কেমন করে'?

এ-ক্ষেত্রে পরিচয় মানে ভালবাসা, তারপর বিয়ে।

কিন্তু নিতান্ত দরিদ্র কলের একটা কুলিকে সে বিয়েই বা করবে কোন্‌ দুঃখে।

কথাটা শুকদেও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলে না।

বললে: না ভূখন, মেয়েছেলে নিয়ে ব্যাপার, এ আমি ভাল বলতে পারছি না; ও-পথ তুই ছেড়ে দে।

ভূখনের মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। গুম হ'য়ে সে চুপ করে' বসে রইলো।

শুকদেও জিজ্ঞাসা করলে: মেয়েটি জানে যে তুই তেল-কলে কুলির কাজ করিস্‌?

ভুখন জবাব দিলে না।

কথা বলছিস্‌ না যে?

ভুখন চুপ করে' রইলো। মনে হ'লো কি যেন সে ভাবছে।

কি রে? জানে?

ভুখন ঘাড় নেড়ে জানালে—জানে না।

শুকদেও বললে ঃ কাজ নেই, ও-সব হাঙ্গামার মধ্যে যাস্ না ভূখন। আমরা গরীব মানুষ।

ভূখন এর প্রতিবাদ করলে না। মুখে একটি কথাও বললে না। দু'খানি মাত্র রুটি কোনোরকমে খেয়ে কাজে চলে গেল।

সেই যে গেল, আর সে ফিরে এলো না।

দু'দিন তার দেখা নেই।

এই দুটো দিন শুকদেও যে কেমন করে' কাটালে তা একমাত্র জানলে সে নিজে, আর তার অন্তর্য্যামী।

নিতান্ত দুর্ভাবনায় দিন যেন তার কাটতেই চায় না।

রান্না করতে ভাল লাগে না, খেতে ভাল লাগে না, কাজ করতে মন চায় না, কাঠ-কয়লার খদ্দের এসে ডেকে ডেকে ফিরে যায়।

শুকদেও চুপ করে' বসে বসে ভাবে। —এ কি হ'লো তার? ভূখন কি সত্যিই তার কথায় রাগ করে চলে গেল? আর কি সে কখনও ফিরে আসবে না?

কথাগুলো তার বলা অন্যায় হয়েছে কিনা সেইটেই সে বেশী করে চিন্তা করে। কিন্তু ভাই যদি তার বয়ে যায়, তার অমন সুন্দর দেবতার মত ভাইয়ের স্বভাব-চরিত্রই যদি যায় নষ্ট হয়ে, তাহ'লে আর বাকি রইলো কি?

এ ব্যাপারটা সে কিছুতেই সহ্য করবে না, তাতে তার ভাইকে যদি জন্মের মত হারাতে হয় তো হোক্।

কথাটা সে মনে মনে বললে বটে, কিন্তু তবু তার মন মানে কই।

জন্মের মত হারানো দূরের কথা, এই দুটো দিনের বিরহও তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো।

শুকদেও উঠলো। পথের ধারে গিয়ে বসলো। তারপর যে-পথ

দিয়ে ভূখন রোজ এখানে আসে সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

কিন্তু বৃথাই বসে থাকা।

ভূখন এলো না।

সেদিনটাও কোনো রকমে কেটে গেল।

তার পরের দিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে' হাতমুখ ধুয়ে শুকদেও গেল তার বন্ধু হরদয়ালের বাড়ীর দরজায়। থম্‌কে থামলো একবার। চট্ করে' ভেবে নিলে—বন্ধুকে বলবে কিনা তার ভাইয়ের কথা। অথচ বলবার জন্যেই সে এসেছে। সুখের ভাগ মানুষ বড়-একটা কাউকে দেয় না। দুঃখ-বেদনায় মানুষের বুক যখন ভরে ওঠে, তখন সে তার ভাগ দেবার জন্যে খুঁজে বেড়ায় দরদী বন্ধু—যার কাছে উজাড় করে দিতে পারে তার দুঃখের বোঝা। কিন্তু প্রতিটি মানুষের নিজস্ব দুঃখ-বেদনার অভাব নেই। তাই সে শুধু শুনে যায় কান দিয়ে। প্রতিকার কিছু করতে পারে না। হরদয়ালও কিছু করতে পারবে না—শুকদেও তা জানে। তবু তার মন মানে না। এ-কথা বলতেই হবে তার বন্ধুকে।

হরদয়াল জেগেছে কি জাগেনি বুঝতে পারছিল না শুকদেও। তাই সে তাকে ডাকবে কি ডাকবে না ভাবছে, এমন সময় ভেতর থেকে হরদয়ালের কাশির আওয়াজ শোনা গেল। অনেক দিনের পরিচিত বন্ধু শুকদেও।

—হরদয়াল রয়েছো বাড়ীতে?

—আরে, কৌন্ হো? শুকদেও?

—হাঁ ভাইয়া। খুব একটা জরুরী দরকারে এসেছি।

হরদয়াল নিজে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। শুকদেওকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বসালো।

হরদয়াল চা খাবার ব্যবস্থা করছিল। হরদয়ালের মেয়ে রুক্মিণীকে বলতে হ'লো না। হাসতে হাসতে আর এক বাটি চা এনে নামিয়ে দিলে শুকদেও-এর হাতের কাছে। হাসতে হাসতে বললে: ভাল আছ চাচাজি?

—হাঁ মায়ি ভাল।

—আর ভূখন-চাচা? কাজে বেরিয়ে গেছে বুঝি?

শুকদেও অন্যমনস্ক হয়ে ব'লে ফেললে: হ্যাঁ।

রুক্মিণী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই শুকদেও বললে হরদয়ালকে: মেয়েটাকে মিথ্যা কথা বললাম, হরদয়াল। ভূখন আজ দু' দিন হ'লো—না, আজ নিয়ে তিন দিন হবে—বাড়ী আসেনি।

কথাটি শুনে হরদয়াল যেন চম্‌কে উঠলো!

কলকাতা শহরে মানুষ তিন দিন বাড়ী ফেরেনি শুনলে চম্‌কে ওঠবার কথাই।

তবে হরদয়াল একটু ভীতু মানুষ। তাই সে বড় বেশী ভয় পেয়ে গিয়ে বললে: থানায় খবর দিয়েছো?

শুকদেও ম্লান একটু হাসলে। বললে: না, থানায় খবর দেবার মত ব্যাপার নয়। তবে শোনো আসল ব্যাপারটা—

বলেই সে সবিস্তারে বর্ণনা করলে ভূখনের কীর্তিকাহিনী।

বললে: বড়লোকের একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে এখানে এনে রাখতে চায় সে। আমি বারণ করেছিলাম। তাই সে আমার ওপর রাগ করে' তিনদিন হলো আসেনি।

বলতে বলতে শুকদেও-এর চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

এত স্নেহ করে সে তার ভাইকে।

হরদয়ালই একমাত্র ব্যক্তি যে সে-কথা জানে। আর জানে বলেই তার কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করবার জন্যে আসা।

আর একটা আঘাত শুকদেও পেয়েছে। সে জানতো তার ভাই দেখতেও যেমন সুন্দর, তার চরিত্রও ঠিক তেমনি। তাই সে বড়াই করে' বলে বেড়াতো সকলের কাছে।

আজ তার সে অহঙ্কার গেল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে।

হরদয়াল বললে : তুমি একবার মাণিকতলায় যাও শুকদেও।

—যাব ?

হ্যাঁ যাও। গিয়ে দেখে এসো সে মেয়েটিকে। জেনে এসো ব্যাপারটা কি।

যেতে শুকদেও পারে। ওই তেলের কলে সে নিজেও একদিন কাজ করেছে। কাজেই সেখানে যাওয়া তার কাছে এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। অন্য কিছু হ'লে—অর্থাৎ ভুখনের অসুখ-বিসুখ হ'লে বা বিপদ-আপদ হ'লে এতক্ষণ সে ছুটে সেখানে চলে যেতো। কিন্তু—

শুকদেওকে চুপ করে' থাকতে দেখে হরদয়াল জিজ্ঞাসা করলে : —কি ভাবছো ? যেতে দোষ কি ?

শুকদেও বললে : না, দোষ কিছু নেই। তুমি ঠিকই বলছো। যাওয়া আমার উচিত। কিন্তু তুমি তো জানো হরদয়াল, আমি এমনিতে চুপ করে' থাকি, সহজে রাগ করি না, কারও সঙ্গে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ভালবাসি না, কিন্তু ঝট্ করে' একবার রেগে যদি যাই তো আমার মাথার ঠিক থাকে না। একটা যা-তা কাণ্ড করে' বসি।

হরদয়াল হাসলে। বললে : এতে রাগ করবার কি আছে শুকদেও ? এমন তো কত হয় ! বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে গরীব লোকের দোস্তি হয় না ? মোহব্বৎ হয় না ? তাতে কি হয়েছে ? মেয়েটির সঙ্গে তুমি দেখা করবে, তাকে সব কথা খুলে বলবে,

তারপর যদি ছ্যাখো, মেয়েটি তোমায় এখানে আসতে রাজি, তখন তাই করবে।

শুকদেও বললে: এইখানে? বড়লোকের মেয়েকে আনবো আমাদের এই নোংরা জায়গায়?

হরদয়াল বললে: মেয়েটি বলছো বড়লোকের মেয়ে। তারই টাকায় আমাদেব এই বস্তিতে ভাল একটা ঘর ঠিক করে দেবো। ভুখনকে আর তেল-কলে কাজ করতে হবে না। ভালই তো!

শুকদেও শুধু 'হুঁ' বলে চুপ করে রইলো। আবার কি যেন ভাবতে লাগলো!

হরদয়াল বললে: আমি বুঝতে পারছি ভূখনের জন্যে মন তোমার খুব খারাপ হয়ে রয়েছে। তুমি আজই চলে যাও সেখানে। এক্ষুণি চলে যাও।

—যাব?

—হ্যাঁ যাও।

—তুমি বলছো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি।

শুকদেও কি যেন ভাবতে ভাবতে উঠে গেল সেখান থেকে। এই পরামর্শ নিয়ে মাণিকতলায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই সে এসেছিল।

শুকদেও মনে মনে যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই।

তেল-কলে গিয়ে দেখে—ভূখন নেই।

তার পরিচিত যারা ছিল সেখানে, সকলকেই সে ভুখনের কথা জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু কেউ তার কোনও পাত্তাই দিতে পারলে না।

তাহ'লে সে গেল কোথায়?

শুকদেও হতাশ হয়ে বসে রইলো মাথায় হাত দিয়ে। ভূখনকে

কিছু না বললেই বোধ হয় ভাল হতো। রাগ করে ভূখন হয়ত তাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করেই চলে গেল।

সকাল থেকে কিছু না খেয়ে এরকম ভাবে বসে থেকে লাভ নেই। তার ওপর মায়া-মমতা যার এতটুকু নেই, যে-ভাই তাকে এমনি করে ছেড়ে যেতে পারে, তার সম্বন্ধে ভেবেই বা সে কি করবে ?

শুকদেও উঠে দাঁড়ালো। মরুক্ গে ছাই, আজ থেকে ভাববে, তার ভূখন বলে কোনও ভাই ছিল না।

পেছন থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে :

শুকদেও !

তাকিয়ে দেখে, তারই চেনা বন্ধু—কিষণলাল, তেল-কলে একসঙ্গে কাজ করেছে। কাজ ছেড়ে দিয়ে বস্তির ভিতর ছোট একটি দোকান করেছে। চিঁড়ে, মুড়ি, ছাতু, গুড় আর ভাজা কড়াই-এর দোকান। মন্দ চলছে না। তেল-কলে কাজ করার চেয়ে অনেক ভাল।

শুকদেও যে ভবানীপুরে কাঠ-কয়লার কারবার করে কিষণলাল তা জানে। ভূখনের কাছে শুনেছে।

কিষণলালকে ভূখনের কথাটা জিজ্ঞাসা করবে কিনা শুকদেও ভাবছিল। ভাবছিল—তার কাছ থেকেও সেই একই জবাব সে পাবে ! তার চেয়ে কাজ নেই কিছু জিজ্ঞাসা করে'।

কিন্তু কিষণলাল নিজেই বললে। যা বললে সে কথা যেন না শুনলেই ভাল হ'তো। বললে : কাজটা ভূখন ভাল করেছে বলে মনে হয় না। মেয়েটা ভাল মেয়ে নয়।

শুকদেও ব্যাপারটা ভাল ক'রে জানতে চাইলে তার কাছ থেকে। বললে : ভূখনের খোঁজেই আমি এসেছি ভাই। তুমি যা জানো আমাকে বল।

কিষণলাল বললে : তাহ'লে এসো আমার দোকানে।

বস্তির একটেরে ছোট্ট একটি দোকান। গরীব মানুষ। পুঁজি ছিল না, তাই তার দাদার এক শালাকে এনেছে জগদ্দলের চটকল থেকে। তাদের দু'জনের ভাগাভাগি কারবার।

ঘরের মাঝখানে খুঁটি পুঁতে চট টাঙ্গিয়ে দু'ভাগ করা হয়েছে। সুমুখে দোকান। পেছনে তাদের দু'জনের থাকবার জায়গা।

শুকদেওকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসালে কিষণলাল।

তার পর সুরু হ'লো ভূখনের কথা।

কিষণলাল বললে ঃ ওই যে বাড়ীটা দেখছো, ওই বাড়ীতে থাকে এক জাঁদবেল বুড়ী···এখানকাব এই তামাম বস্তির মালিক। আর ওই বাড়ীর ভেতর থাকে কমবয়েসী অনেকগুলি মেয়ে। বুড়ী বলে, সব তার বহিনের লড়্‌কি। নানান্ রকমের লোক ওই বাড়ীতে হরদম্ যাওয়া-আসা করে। তবে দারু কেউ পিয়ে হল্লা করে এটা বুড়ী চায় না। একদিন একটা লোক খুব হল্লা কবতে লাগলো। বুড়ীও যত চিল্লায় সে লোকটাভি তত চিল্লায। বুড়ী কিছুতেই তাকে বাহার নিকাল্‌তে পাবে না। ঠিক সেই সময়ে আমাদেব ভূখন পেরিয়ে যাচ্ছিল ওই রাস্তা দিয়ে। বুড়ী ভূখনকে ডেকে বললে, শোনো তো বাবা, এই লোকটাকে বের করে' দাও তো! ভূখনের গায়ে তো তাগদ্ খুব। লোকটাকে বেশ করে' দু'চার ঘা গাঁত্তা-গোঁত্তা দিতেই লোকটা দিলে ভূখনের গায়ে বমি করে'। ভূখন তক্ষুণি তাকে আড়কোলা করে' একেবারে বড় রাস্তায় দিয়ে এলো বসিয়ে। ভূখনকে বুড়ী ডেকে নিয়ে গেল তার ঘরে। বেশ করে' স্নান-টান্ করিয়ে কাপড়-চোপড় বদ্‌লে দিয়ে কি যে বললে আর কি যে করলে ভূখনই জানে, রোজই দেখি, ভূখন সেই থেকে বুড়ীর বাড়ীতে আড্ডা গাড়লে। তার পর এখন তো দেখছি তেল-কলের কাজ ছেড়ে দিয়ে ওইখানেই ভূখন তার ঘর-বাড়ী করে'

নিয়েছে। সেদিন আমার দোকানে এসেছিল ভুখন। বললে নাকি ওখানে একটি মেয়ে আছে সখিয়া তার নাম। ভবানীপুরেই আগে থাকতো সে। ভুখন তাকে নাকি বিয়ে করে' ভবানীপুরেই তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবে।

এই তো ভুখনের ইতিহাস।

সব কিছু শুনে শুকদেও কিছুক্ষণ চুপ করে' বসে বসে কি যেন ভাবলে। তাব পর কিষণলালকে জিজ্ঞাসা করলে: এখন কি কবা যায় বল তো কিষণ ?

কিষণলাল বললে: সে কথা তুমিই ভাল বুঝবে।

শুকদেও বললে: বুঝতেই যদি পাববো তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো কেন? আচ্ছা, বলতে পারো, মেয়েটাব গাই আছে? বক্‌রি আছে?

কিষণলাল বললে—অত খবব সে জানে না।

শুকদেও বললে: তোমাকে একটি কাজ কবতে হবে ভাই।

—কি কাজ বল।

শুকদেও তাকে ধবে' বসলো: ভুখনকে একটিবাব এইখানে ডেকে নিয়ে এসো। এলাম যখন, দেখা কবেই যাই।

কিষণলাল রাজি হ'লো।

নিজে গিয়ে ডেকেও আনলে ভুখনকে।

কিন্তু এবাব তাদেব কথাবার্ত্তায় কিছুতেই সে থাকলো না। এই পাড়ায় দোকান কবে' খেতে হয় তাকে। ভুখনকে সে চটাবে না, সখিয়াকেও না। বুড়ী বাড়ীউলিকে তো নয়ই।

শুকদেও ভেবেছিল ভুখনকে আর কিছুই সে বলবে না। ভাই তাব একটা মেয়ে নিয়ে বাস করবে, করুক। চিবজন্মের মত ভাইকে পরিত্যাগ কবার চেয়ে ভাল।

কিন্তু যে-মানুষের মুখের কথাকে মানুষ অনেক সময় তুচ্ছ এবং সামান্য বলে' উড়িয়ে দেয়, সেই সামান্য মুখের কথাই অনেক সময় অসামান্য হয়ে ওঠে। মুখের কথায় দেবতা তুষ্ট হয়। সেনাপতির মুখের কথায় যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত সৈন্য জীবন বিসর্জ্জন দেয়। বাচালের মুখের কথাকে কেউ গ্রাহ্যই করে না, আবার একটি মুখের কথায় অনেক সময় আগুন জ্বলে ওঠে।

ভুখন প্রথমে তার দাদার কাছে এসে দাঁড়ালো। মাথা হেঁট করে' নিতান্ত অপরাধীর মত।

শুকদেও-এর চোখ দু'টো জলে ভরে এলো। বললে : চল্ বাড়ী চল্।

ভুখন ঘরের খুঁটিটা ধরে মাথা হেঁট করে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইলো। কোনও কথা বললে না।

শুকদেও আবার বললে : চুপ করে রইলি কেন, চল্।

ভুখন বললে : যেতে হ'লে সখিয়াকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

শুকদেও বললে : যার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়নি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কি উচিত? তার সঙ্গে এক ঘরে বাসই বা তুই করবি কেমন করে?

ভুখন বললে : বিয়ে করবো।

শুকদেও বললে : বেশ ভাল করে ভেবে ভাখ্ ভুখন। আমি এখনও বিয়ে করিনি—আমরা গরীব, বৌকে খেতে-পরতে দিতে পারবো না বলে। আর তুই—সামান্য একটা তেল-কলের মজুর, বিয়ে করবি?

ভুখন বললে : হ্যাঁ করবো।

এরকম ভাবে শুকদেও-এর সঙ্গে ভুখন কথা বললে এই প্রথম।

শুকদেও-এর মাথার রক্ত চট্ করে গরম হয়ে গেল। সকাল

থেকে সে অভুক্ত। সকাল থেকে কেন, আজ দু'দিন তার এক-রকম খাওয়াই হয়নি, তার ওপর যার জন্যে তার এত দুশ্চিন্তা, তারই সেই সহোদর ছোট ভাই কিনা তার মুখের ওপর জবাব দিলে ?

শুকদেও বেশ চড়া গলায় আবার জিজ্ঞাসা করলে : বিয়ে করবি ?

ভুখন বললে : হ্যাঁ, বিয়ে করবো।

তার পর ?—শুকদেও বললে, খুব ভাল করে ভেবে ছাখ্ ভুখন, আমি তোর দাদা, আমি জীবনে আর তোর মুখ দেখবো না। আমাকে ছেড়ে সারা জীবন তুই ওকে নিয়ে কাটাতে পারবি ?

মানুষের মুখ যখন খুলে যায়, লজ্জার বাঁধ একবার যখন ভাঙ্গে, তখন আর তাকে আট্‌কানো শক্ত হয়ে উঠে।

ভুখন বললে : পারবো।

শুকদেও বললে : মেয়েটা কিন্তু ভাল নয় ভুখন !

—কে তোমাকে বললে একথা ? কিষণলাল ?

—আমি শুনেছি।

ভুখন বললে : ভুল শুনেছো তুমি ?

শুকদেও বললে : তুই যে বলেছিলি মেয়েটার গাই আছে, বক্‌রি আছে—সব মিছে কথা।

ভুখন বললে : না, সব সত্যি কথা। ভবানীপুরে ওর এক মামী আছে, তার কাছে রেখেছে। সখিয়াও ভবানীপুরে ছিল, সেইখান থেকেই এসেছে এখানে।

শুকদেও বললে : এসেছে বাড়ীউলির কাছে।

ভুখন বললে : হ্যাঁ, ওর বাবা মারা যাবার পর মামীর কাছে আর থাকতে চায়নি। সে সব অনেক কথা দাদা, পরে সবই জানতে পারবে।

শুকদেও বললে : জানতে আমি চাই না ভুখন ! বিয়ে-থা সমানে

সমানেই করতে হয়। তুই এক পয়সা রোজগার করতে পারিস্ না, আর ওই মেয়েটি যা শুনছি, তোর চেয়ে তার অবস্থা ভাল, আর যা শুনেছি তা না বলাই ভালো। তোরা সুখী হতে পারবি না—এই আমার ভয়।—এবার তুই যা ভাল বুঝিস্ তাই কর। আমি চললাম। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

এই বলে শুকদেও সত্যি সত্যিই চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

কিষণলাল তার দাদার শালাকে বাইরে কোথায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই বসেছিল দোকানে। খদ্দের ছিল না। কেরোসিন কাঠের একটা বাক্সর ওপর বসে বসে সবই শুনছিল।

শুকদেও কিছু বলবার আগে কিষণলালই বলে উঠলো ঃ চললে ?

শুকদেও বললে ঃ হ্যাঁ ভাই। ভূখন আমার কোনও কথাই শুনবে না।

এই বলে সে দোকান থেকে নেমে রাস্তা ধরলে। ভূখনের মুখের পানে একবার ফিরেও তাকালে না। ভাইকে এম্‌নি করে' ছেড়ে যেতে কি কষ্ট যে তার হচ্ছিল তা' সেই জানে! তবু তাকে যেতে হলো।

দাদার চলে-যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ভূখন।

পথের বাঁকে শুকদেওকে যখন আর দেখা গেল না, ভূখন তখন কিষণলালের দিকে কট্‌মট্ করে' তাকিয়ে বেশ একটু অস্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে ঃ সখিয়া ভাল মেয়ে নয়—দাদাকে একথা কে বললে ? তুই ?

কিষণলাল একটু ভীতু মানুষ। ভয়ে ভয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে বলল ঃ না তা বলিনি। তোর দাদা বাড়ীউলির কথা জিজ্ঞাসা করছিল, তাই—

ভূখন বললে ঃ বুঝতে পেরেছি।

বলেই সে হন্-হন্ করে' সখিয়ার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

কিষণলাল চীৎকার করে' তাকে ডাকতে লাগলো: ভুখন! ভুখন! ভুখ্‌নোয়া! ভুখ্‌নোয়া! আরে ভেইয়া! শোন্ তো!

শোনা দূরে থাক্, ভুখন একবার পিছন ফিরে তাকিয়েও দেখলে না।

শুকদেও ভবানীপুরে ফিরে এলো তার সেই পুরনো আস্তানায়। মন খুব খারাপ। কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না।

কাঠ-কয়লার খরিদ্দার আসে। নেহাৎ যা বললে নয় তাই বলে। পয়সা না দিয়ে ধারে যারা জিনিস চায়—বকতে হয় তাদেরই সঙ্গে বেশী। ধার দেওয়া শুকদেও পছন্দ করে না। আর তার ধার দেবার ক্ষমতাও নেই। নিতান্ত গরীব একজন দিন-মজুর সে। তার বন্ধুর কৃপায় আর তার সততার গুণে সে আজ এই অবস্থায় এসেছে।

তাছাড়া খরচও তার কম। একা মানুষ। বিয়ে-থা করেনি। ঘরের ভাড়া মাত্র দু'টাকা মাসে।

বাড়ীর মালিক থাকেন একটু দূরে। আগে একটা লোক মাসে মাসে ভাড়া আদায় করে নিয়ে যেতো। তারপর তার আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তখন সে নিজে গিয়ে জমিদার বাবুকে ভাড়া দিয়ে আসতো। গত দু'মাস তাও বন্ধ। মাটির একটি ভাঁড়ে ভাড়া বাবদ চারটি টাকা সে তুলে রেখেছে। নিজে গিয়ে দিয়ে আসবার সময় করে' উঠতে পারেনি।

আজ সে মাণিকতলা থেকে ফিরে এসেই দেখলে, জমিদারবাবু নিজে সপরিবারে উঠে এসেছে এই ভাঙা বাড়ীটাব দোতলায়।

শুকদেও ভাবলে, কাল সকালেই ভাড়ার চারটি টাকা সে নিজে গিয়ে দিয়ে আসবে জমিদারবাবুকে।

যেতে হ'লো না।

সকালে ব্রজকিশোরবাবু নিজেই নেমে এলেন নীচে। সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং, পরনে কোঁচানো ধুতি, সাদা গিলে-করা পাঞ্জাবি, হাতে একটা মোটা লাঠি। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন কিনা কে জানে।

শুকদেও সবেমাত্র একটি খদ্দেরকে বিদায় করে' ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, পেছনে মোটা গলার ডাক শোনা গেল : কি রে! তোর নামটি কি ভুলে যাচ্ছি।

শুকদেও ফিরেই দেখে জমিদারবাবু স্বয়ং। ভালই হ'লো—আর যেতে হ'লো না!

'আসছি।' বলেই চট্ করে' ঘরে ঢুকে সেই মাটির ভাঁড়ে হাত ঢুকিয়ে ভাড়ার চারটি টাকা আনতে গিয়ে দেখে, টাকা নেই। ভাঁড় খালি।

মাথাটা তার চন্ করে' ঘুরে গেল। ভূখনের জন্য একে তো তাব মন-মেজাজ খারাপ হয়েই ছিল, তার ওপর এই ব্যাপাব!

বাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। চট্ করে' তার কোমরের গেঁজেতে বাঁধা টাকা থেকে চারটি টাকা বের করে' শুকদেও বাইরে বেরিয়ে এলো। ব্রজকিশোরবাবুকে গড় হয়ে একটি প্রণাম করে' টাকা চারটি তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে : তু'মাসের ভাড়া—দিয়ে আসতে পারিনি।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন : সে কি রে? তোর ভাড়া তো কাল আমি পেয়েছি। কে দিলে সে টাকা—আমার তো ঠিক মনে পড়ছে না।

শুকদেও হাত জোড় করে' বললে : সে কি হুজুর, আমি তো তু'মাসের ভাড়া দিইনি।

তুই না দিলেও আর-কেউ দিয়েছে। রাখ্ এখন তোর এই

টাকা। আর যদি দিতেই চাস্ তো ভাল, দু'মাসের অগ্রিম নিয়ে গেলাম। নেবো ?

বলে' ব্রজকিশোরবাবু তার দেওয়া টাকা চারটি তুলতে যাচ্ছিলেন।

শুকদেও বললে : সেই ভাল হুজুর, আপনি ও-টাকা নিয়েই যান। আমি দেখছি—কে দিলে আমার ভাড়া।

টাকা নিয়ে ব্রজকিশোরবাবু চলে গেলেন দোতলায়।

শুকদেও মহা ভাবনায় পড়লো। ভাঁড়ের টাকা চারটি নেই। ভাড়াও দেওয়া হয়ে গেছে। ওই টাকার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা তাই-বা কে জানে ! কিন্তু তাই-বা কেমন করে' সম্ভব ? ভাঁড়ে যে ভাড়ার দরুণ টাকা তোলা আছে সে কথা জানবেই বা কে, আর ওই ভাঁড় থেকে বাইরের কেউ টাকা বের করবেই-বা কেমন করে ?

তবে কি ভূখন এই কাজ করেছে ?

কিছুই বুঝতে পারছিল না শুকদেও।

এই কথা ভাবতে ভাবতে শুকদেও উনোন ধরালে, 'রোটি' বানালে, খেলে, তারপর মানসিক দুশ্চিন্তায় জর্জ্জর মন নিয়ে তার খড়ের বিছানায় একটু গড়িয়ে নিলে। এ-সব কথা ভাবতে তার ভাল লাগছিল না। সংসারে তার একমাত্র বন্ধন ওই ছোট ভাই ভূখন। সেই ভূখনও যখন তাকে এমনি করে' ছেড়ে চলে গেল তখন আর তার চিন্তার কি আছে ? সে একা। সে স্বাধীন। নিজের দু'বেলা চলে যায়—এমনি কিছু রোজগার করতে পারলেই ব্যস, আর তাকে কিছুই করতে হবে না। সেদিন সে গুণে গুণে দেখেছে তার গেঁজের টাকা-গুলো ; আর মাত্র ত্রিশ টাকা হলেই তিনশ' টাকা হবে। এইটে তার জমানো টাকা। একজন মজুর ছিল সে। এমন দিনও তার গেছে যেদিন দু' পয়সার ছাতুও জোটেনি। আজ তারই হাতে এই

এতগুলো টাকা। ইচ্ছে করলেই সে বিয়ে করতে পারে, বৌ আনতে পারে। কিন্তু না, ভুখনের মত অমন কাঁচা কাজ সে করবে না। জীবনটা সে এমনি করেই কাটিয়ে দেবে।

ভেবেছিল, সে ঘুমিয়ে পড়লে সব চিন্তার অবসান হয়ে যায়। কিন্তু চোখে তার ঘুম কিছুতেই এলো না। নানান চিন্তার সূত্র ধরে' ঘুরে ঘুরে সেই এক কথাই মনে আসে। ভুখনের কথা। তার এক-মাত্র সহোদর ভুখনের কথা।

মনে হ'লো বাইরে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে।

শুকদেও তাড়াতাড়ি উঠে বসলো।

বাইরে এসে দেখে, অবাক কাণ্ড !

ভুখন একটা গাই আর একটা বাছুর নিয়ে এসেছে। চমৎকার গাই, চমৎকার বাছুর। ভুখন গাইটাকে বাঁধছে উঠোনের এক পাশে, যেখানে তার বক্‌রিটা থাকতো—সেইখানে।

যে-ভুখনের ওপর রাগ করে' সে চলে এসেছে সেদিন, যার কথা সে আর চিন্তা পর্য্যন্ত করবে না ভেবেছিল, আজ সেই ভুখনকে আসতে দেখে আনন্দে বুকখানা তার যেন ভরে গেল, চোখ দুটো অনর্থক জলে ভরে এলো।

শুকদেও ডাকলে ঃ ভুখন !

ভুখন জবাব দিলে না। গাইটাকে বাঁধছে এক মনে। বোধ হয় সে শুনতে পায়নি। শুকদেও একটুখানি এগিয়ে গিয়ে ডাকলে ঃ ভুখন !

গাইটাকে বেঁধে দিয়ে ভুখন বললে, রইলো গাই আর বাছুর। সন্ধ্যেয় দুধ দেবে পাঁচ সের। সকালে পাঁচ সের। খাওয়াবার ব্যবস্থা কোরো। আমি চললাম।

শুকদেও বললে ঃ চললাম কি রে ? আর কিছু বলবি না ! বসবি না একটু ?

ভূখন বললেঃ না। তুমি ভেবেছিলে আমি মিছে কথা বলছি। তাই দিয়ে গেলাম এই গাই আর বাছুর। ওদের খাওয়াবে, দুধ বিক্রি করবে।

শুকদেও বললেঃ দুধ বিক্রির টাকা কি করবো?

তুমি রাখবে।

বলেই হন্-হন্ করে' ভূখন চলে গেল। আর একটি কথাও বললে না। শুকদেও চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো। কত কথা ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করবার। কিন্তু আব কিছুই সে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

শুকদেও গাইটার গায়ে হাত বুলোচ্ছিল। বাছুরটাব মুখ দড়ির জাল দিয়ে বন্ধ ক'বে দেওয়া হয়েছে। দুধ দুইবার পব বাঁধন খুলে দিতে হবে।

ভূখন ফিবে এলো আবার।

বললেঃ মাটিব ভাঁড়ে চারটি টাকা বেখেছিলে তুমি, ওই টাকা আমি নিয়েছি; তোমাকে বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বলবার সময় পাইনি।

তখন সে ঝড়ের মত এলো, আবার তেমনি ঝড়ের মতই চলে গেল।

ভাঁড়ের টাকা তাহ'লে ভূখনই নিয়েছে। যাক্, একটা দুশ্চিন্তা গেল।

ভাঁড়ের টাকার সন্ধান মিললো, কিন্তু ভাড়ার টাকা? ওটা কে দিলে—এখনও তার কিছু নিরাকরণ হ'লো না।

কিন্তু এখন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে চলবে না। গাই-বাছুরের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। দুধ দুইবাব ব্যবস্থা করতে হবে। তার ওপর পাঁচ সের পাঁচ সের দশ সের দুধেব খরিদ্দার চাই।

আজকের দুধ সে বিলিয়ে দেবে।

জমিদারবাবুকে দেবে, তার বন্ধুকে দেবে, দয়াময়কে দেবে।

বুড়ো গোপালবাবুর কথা মনে হতেই ভাবলে তাকেও দেবে। অনেকে হয়ত' বলবে—যে তার ছাগলটিকে মেরে ফেলেছে, যে তার এত ক্ষতি করেছে, তাকে দুধ দেওয়া কেন?

কেন তা সে জানে না। তবু যে কাজ সে স্বেচ্ছায় করেনি, যে-কাজ দৈবাৎ ঘটে গেছে, তার জন্য তাকে দায়ী করা চলে না। দুধ তাকে সে সবার আগে দেবে। বুড়ো মানুষ, খাঁটি একটু দুধ পেলে খুশীই হবে।

আর ওই যে বিপিনবাবু? যে-ছোকরাটিকে দেখলে বড় ভাল বলে মনে হয়, তাকেও দেবে।

দুধ সে কাকে কাকে দেবে তার হিসেব হয়ে গেল।

শুকদেওকে বাজারে যেতে হবে।

ভূখন তার অনেক কাজ বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

কথাটা সবাই শুনলে।

এই বাড়ীটার যেখানে যত লোক ছিল—কারও আর জানতে বাকি রইলো না—শুকদেও মস্ত বড় একটা গাই এনেছে।

এ-বেলায় পাঁচ সের, ও-বেলায় পাঁচ সের—এই দশ সের দুধের কথাই বলেছিল শুকদেও। কিন্তু মানুষের মুখে মুখে বাড়তে বাড়তে দুধের মাত্রাটা যে এত তাড়াতাড়ি এত বেশী বেড়ে যাবে—শুকদেও নিজেও তা ভাবতে পারেনি।

পরদিন সকাল থেকে ক্রমাগত লোকের পর লোক আসতে লাগলো—গাই দেখবার জন্যে। গাই তারা অনেক দেখেছে, কিন্তু এত বেশী দুধ-দেওয়া গাই একটা দেখবার জিনিস বই-কি? কেউ শুনেছে গাইটা দুধ দেয় আধ মণ, কেউ শুনেছে তিরিশ সের, কেউ শুনেছে এক মণ।

গাইটা এত বেশী দুধ দিচ্ছে যে, শুকদেও দুধ বেচবার লোক পাচ্ছে না। যে যাচ্ছে তাকেই সে অন্ততঃ আধ সের করে' খাঁটি দুধ বিতরণ করে' দিচ্ছে বিনা মূল্যে।

একেবারে খালি হাতে খবরটা নিতে কেউ আসেনি। ছোট বড় দু'একটা ঘটি প্রায় প্রত্যেকের হাতেই ছিল।

শুকদেও অবশ্য সত্য কথাই বললে সবাইকে। বললে, ভূখন বলে গিয়েছিল এক এক বেলায় পাঁচ সের করে' দুধ দেবে। কিন্তু নূতন জায়গায় এসেছে বলে বোধ হয় ঠিক ততটা দুধ পাওয়া যাচ্ছে না। কাল পেয়েছিলাম সের-তিনেক, আর আজ সকালে যা পেলাম, মেপে দেখিনি। তা প্রায় চার সের হবে।

তবে দুধের খবরটা নিতে এসে তারা এই খবরটা বড় বেশী করে' জেনে গেল যে, ভুখনের মত এত ভাল ভাই কারও হয় না।

সকালে আর সকলকে দুধ দেওয়া শেষ করে' ব্রজকিশোরবাবুকে সেরখানেক খাঁটি দুধ দিতে গিয়েছিল শুকদেও নিজে।

দুধ দেখে ব্রজকিশোরবাবু বললেন: খাঁটি দুধ যদি তুমি দিতে পারো তো আমাকে রোজ দু'বেলা দু'সের করে' দুধ দিতে পারো। মাসের শেষে দাম পাবে।

শুকদেও রাজি হলো। একটি নমস্কার করে' সে চলে আসছিল, ব্রজকিশোরবাবু তাকে আবার ডাকলেন। বললেন, সেই যে তোমার ভাড়ার কথাটা বলেছিলাম, কে আমাকে দিয়েছে তখন ঠিক মনে করতে পারছিলাম না, তারপর মনে পড়লো। টাকাটা দিয়েছে—দয়াময়ের হোটেলে যে-ছোকরাটি ছবি-টবি আঁকে সেই ছোকরাটি। তোমার কাছে ধার-টার নিয়েছিল বোধ হয়।

ছোকরাটি যে কে, শুকদেও তা বুঝতে পারলে, কিন্তু টাকা সে তার কাছ থেকে ধার কখনও নিয়েছিল বলে মনে পড়লো না।

বিপিন তার নিজের ঘরে বসে বসে—নিবিষ্ট মনে কি যেন লিখছিল। শুকদেও ঘরে ঢুকলো—হাতে একটি ঘটিতে এক ঘটি দুধ নিয়ে।

বিপিন মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে : কি খবর শুকদেও ?

শুকদেও বললে : আপনার জন্যে একটু দুধ এনেছি বাবু। আমার ভাই ভূখন একটা গাই দিয়ে গেছে। নতুন গাই—তারই দুধ। আপনি একটু খেয়ে দেখবেন।

বিপিন বললে : কাঁচা দুধ তো খেতে পারবো না শুকদেও। দয়াময়ের হোটেলে দাও গে। তারা গরম করে' দেবে আমাকে।

শুকদেও মৃদু একটু হেসে বললে : তারা ঠিক দেবে না বাবু। এটা খাঁটি দুধ। ওরা এর সঙ্গে আদ্ধেক জল মিশিয়ে দেবে।

তাহ'লে কি তুমি আমাকে কাঁচাই খেতে বলছো ?

শুকদেও বললে : আজ্ঞে না। যদি বলেন তো আমি আপনাকে গরম করে' এনে দিচ্ছি।

বিপিন কাজ করতে করতে বললে : দাও।

শুকদেও চলে গেল। তার ঘরে তখন তোলা উনুনের আঁচ বেশ ধরে উঠেছে। দুধটুকু গরম করতে বেশী দেরি হ'লো না। পরিষ্কার একটি গ্লাসে দুধ এনে শুকদেও বললে : এক্ষুণি খেয়ে নিন্ বাবু!

দুধ খেয়ে বিপিন বললে : এ দুধ তুমি বিক্রি করবে তো ?

শুকদেও বললে : হ্যাঁ বাবু, নইলে এত দুধ নিয়ে আমি কি করবো ?

—সব দুধ নেবার লোক ঠিক হয়ে গেছে ?

শুকদেও বললে : না। এখনও হয়নি।

বিপিন বললে : আমাকে কিছু দিতে পারো ?

শুকদেও বললে : আপনাকে দিতে হ'লে এমনি গরম্ করে' এনে

খাইয়ে দিয়ে যেতে হবে বাবু, নইলে আপনি কোন দিনই খাঁটি দুধ খেতে পাবেন না।

বিপিন বললে: না না, তা কেন? আমার জন্যে তুমি এত কষ্ট করতে যাবে কেন? আর আমাদের হোটেলেই যদি দাও, তাতেই বা দোষ কি? ওরা ঠিকই দেবে আমাকে।

শুকদেও বিপিনের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, আপনি সব লোককেই বিশ্বাস করেন বাবু?

বিপিন বললে: কেন করবো না? মানুষকে বিশ্বাস করবো না তো কাকে বিশ্বাস করবো শুকদেও?

শুকদেও হাত দু'টি জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে বললে: ভগবান্ আপনার ভাল করুন!

শুকদেও এতক্ষণ পরে তার আসল কথাটি জিজ্ঞাসা করলে। বললে: আপনি কি আমার হয়ে আমাদের কর্ত্তাবাবুকে কিছু টাকা দিয়েছেন?

বিপিন একটু হাসলে। হেসে বললে: সে কথা জেনে তোমার কি হবে?

শুকদেও বললে: আপনি আমার বাড়ীর ভাড়া কেন দিয়েছেন বাবু?

বিপিন বললে: আমি তোমাকে ভাল করে' চিনতাম না শুকদেও। কিন্তু সেই দিন চিনলাম যেদিন তোমাব ছাগলটি মরে গেল। গোপালবাবু তোমাকে দিতে চাইলেও তোমার ছাগলের দাম তুমি নিতে না তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তাই তোমার সেই ছাগলের দাম বলে পাঁচটা টাকা আমি দিয়ে দিয়েছি বড়বাবুকে।

শুকদেও বললে: তা আপনি কেন দেবেনবাবু?

বিপিন বললে: আমি দিইনি, গোপালবাবু দিয়েছেন।

শুকদেও বললে: গোপালবাবুকে আমি বহুৎ দিন থেকে চিনি বাবু। তিনি দেবার লোক ন'ন। এ টাকা গোপালবাবুর হয়ে আপনি দিয়েছেন।

বিপিন বললে: সেকথা তোমার বলবার দরকার দেই। ও টাকা তোমাকে নিতেই হবে। তুমি গরীব মানুষ, তুমি কেন ক্ষতি স্বীকার করবে?

শুকদেও বললে: না বাবু, সেটা গোপালবাবু দিলেও আমি নিতাম না। তিনি তো বক্‌রিটাকে ইচ্ছে করে' মারেননি। দৈবাৎ মরে গেছে। না বাবু, এরকম ভাবে আমাকে অপরাধী করবেন না।

বিপিন বললে: এ টাকা নিলে তোমার অপরাধ কেন হবে— আমি তো বুঝতে পারছি না শুকদেও।

শুকদেও বললে: আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না বাবু!

টাকাটা নিতে শুকদেও কিছুতেই রাজি হ'লো না। গোপালবাবু দিলেও সে নেবে না।

এ আশঙ্কা অবশ্য বিপিনের ছিল। তাই সে টাকাটা দিয়েছিল তার অবর্ত্তমানে—ব্রজকিশোরবাবুর হাতে। বেমক্কা লাথি খেয়ে ছাগলটা মরে গেছে। গোপালবাবু ইচ্ছে করে' মারেননি ছাগলটাকে শুকদেও তা' বুঝতে পেরেছিল, আর সেইজন্যই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছ থেকে জরিমানা-স্বরূপ ছাগলের দামটা শুকদেও লজ্জায় তখন চাইতে পারেনি। চাইলেও গোপালবাবু দিতেন কিনা সন্দেহ। কারণ, তাঁর বাড়ী থেকে বহু প্রত্যাশিত যে চিঠিখানি এসেছিল, যে-চিঠি তিনি তখনও পড়েননি, আস্ত সেই চিঠিখানি গলাধঃকরণ করার মত অমার্জ্জনীয় অপরাধ যে-ছাগল করতে পারে, তার মৃত্যুর জন্য মনে তাঁর বিন্দুমাত্র অনুশোচনা ছিল না। সুতরাং ছাগলের দাম দেওয়া

দূরে থাক্, তাঁর চিঠির খেসারৎ স্বরূপ শুকদেও যদি কিছু অর্থদণ্ড দিতে পারতো হয়ত' বা তাও তিনি গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

শুকদেও-এর ছাগলটা গোপালবাবুর বিচারে অপরাধী হলেও শুকদেও নিরপরাধ। বেচারার ছাগলটা গেল, তার পেটে যে বাচ্চাগুলো ছিল, তারাও গেল। বেচারা গরীব। মিছেমিছি তার এই শাস্তি ভোগ কেন হবে?

এই ভেবে বিপিন তার ছাগলের দাম বলে' পাঁচটি টাকা নিজেই দিয়েছিল গোপালবাবুর হয়ে; ভেবেছিল তখন যে-টাকা সে নিতে পারেনি, কিছুদিন পরে সেই টাকা এমনি ভাবে সাম্‌না-সাম্‌নি চক্ষুলজ্জা এড়িয়ে যদি তার হাতে আসে, হয়ত-বা নিতে সে কুণ্ঠিত হবে না। গরীব মানুষ। পাঁচটা টাকার দাম তার কাছে নিতান্ত কম নয়।

কথাটা সত্য। পাঁচটা টাকার মূল্য শহরের একজন অশিক্ষিত মুটে-মজুর শ্রেণীর লোকের কাছে খুব বেশী হওয়াই সম্ভব, কিন্তু শুকদেও-এর ধর্ম্মজ্ঞান, সততা, ভদ্রতা এবং সকলের উপরে তার পবিত্র নির্ম্মল চরিত্রের মূল্য যে তার চেয়ে অনেক বেশী—বিপিনের সেকথা জানা ছিল না।

শুকদেও বারম্বার শুধু এই কথাই বলতে লাগলো যে, সে-একজন নিতান্ত মূর্খ এবং অশিক্ষিত ব্যক্তি। তাদের মত শিক্ষিত ভদ্রলোকের পদসেবা করবার যোগ্যতাও তার নেই। তারা যে তাকে শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন এইটুকুই তার পরম সৌভাগ্য। সুতরাং তাকে যেন তার মরা বক্‌রির দাম বলে পাঁচটি টাকা নিতে বাধ্য না করা হয়।

বিপিন আর কোনও কথাই বলতে পারলে না।

শুকদেও তার কোমরের গেঁজে থেকে বের করে' পাঁচটি টাকা বিপিনের হাতের কাছে নামিয়ে দিলে।

টাকা পাঁচটি বিপিনকে ফিরিয়ে নিতে হ'লো। আর তা' নিতে গিয়ে মূর্খ এই অশিক্ষিত লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা যেন তার শতগুণে বেড়ে গেল।

সেইদিনই 'ইম্পিরিয়াল্ বোর্ডিং হাউসে'র রান্নাঘরে খেতে গিয়ে বৃদ্ধ গোপালবাবুর সঙ্গে বিপিনের দেখা।

আরও অনেকেই সেখানে ছিল। কি একটা আলোচনাও যেন চলছিল। বিপিন তার মাঝখানেই গিয়ে উপস্থিত হ'লো।

বিপিনকে দেখেই বৃদ্ধ গোপালবাবুই আগে বলে উঠলেন: এই যে আমাদের বিপিন ঠিক বলতে পারবে। আচ্ছা বল দেখি ভাই, ওই যে ব্যাটা ছাতুখোর সুখদেব না দুখদেব—ব্যাটার কি রকম টাকা হয়েছে!

বিপিন বুঝতে পারলে, আলোচনাটা তাকে নিয়েই। বললে: হঠাৎ ওর টাকার ওপর আপনার নজর পড়্‌লো কেন বলুন তো?

গোপালবাবু বললেন: নজর একা আমার কেন দাদা, সবারই পড়েছে। সেদিন ওর সেই ছাগলটা মরে গেল তুমি বললে, আহা বেচারা গরীব! গরীব না কচু! দেখেছো কি রকম একটা ভাগলপুরী গাই এনেছে। রীতিমত টাকা না হ'লে ওই রকম গাই কখনও কেউ কিনতে পারে? এইবার দেখবে এক সের দুধে পাঁচ সের জল মিশিয়ে সেই দুধ বিক্রি করে' ব্যাটা দু'দিনেই লাল হয়ে যাবে।

বিপিন বললে: ওই গাইয়ের দুধ তো দেখছি শুকদেও সবাইকে দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনাকে দেয়নি?

গোপালবাবু অস্বীকার করতে পারলেন না। মুখ দেখে মনে হ'লো পারলে বোধ হয় খুশী হতেন। বললেন: জলটা মিশিয়ে দিয়েছিল ছটাকখানেক। খেয়ে দেখলাম—আমাদের বাংলা গাই-এর দুধ যে রকম মিষ্টি সে রকম মিষ্টি নয়।

আর একজনের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, দুধ কেন দিয়েছে বুঝতে পেরেছো? ভয়ে। ভয়ে। ধরো গাইটাও বেঁধেছে এমন জায়গায়, যেখানে গাই-বাছুর বাঁধা আমরা একটা মিটিং কল্ করে' বন্ধ করে' দিতে পারি। তারপর ধরো, যখন তখন যাচ্ছি আমরা ওই দিক পানে, ও যে রকম গাই, শিং উঁচু করে' তেড়ে আসা আশ্চর্য্য কিছু নয়। তেড়ে আসা কেন, ধরো বড় বড় শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দিতেই-বা কতক্ষণ! দেয় যদি তো একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে যাবে, ফৌজদারী মামলা পর্য্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এই সব নানান কারণে সব দিক ভেবেচিন্তে আমাদের একটু করে' জল মিশিয়ে দুধ খাইয়ে দিলে। তাই বলে কি রোজ দেবে, তা দেবে না। হেঁ হেঁ বাবা, ওই রকম ভাল মানুষটি সেজে থাকে ব্যাটা ছাতুখোর, নইলে কাঠ-কয়লা বেচে যে গাই কিনতে পারে, তাকে চিনতে এখনও অনেক দেরি।

কথাগুলো গোপালবাবু যাকে বলছিলেন, তিনি কিন্তু গোপালবাবুর কথাগুলো ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন: না গোপালবাবু, ঠিক তা নয়। গাইয়ের অতটা দুধ ওকে বেচতে হবে তো? তাই ও আমাদের খদ্দেব করতে চায়। হাতের কাছে আমাদেব মত খরিদ্দার পেলে ওকে আর দূরে যেতে হয় না। তাছাড়া, ও জানে যে আমরা সবাই চাকরি কবি, মাসের শেষে মাইনে পাই, কাঁচা পয়সাটা হাতে থাকে, টাকাটা মারা যাবে না, দু-চারবার তাগাদা করে' শেষে কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিলেই মান-সম্মানের ভয়ে টাকাটা ফেলে দেবো। তাই ও একটু করে' আমাদের সবাইকে দুধের নমুনা দিয়ে গেল। কারবারী মানুষেব দস্তুরই এই। ও একটা ব্যবসাদারী চাল। মনে করেছে আমরা বুঝতে পারবো না। খাঁটি দুধের লোভে আমরা ঝপাঝপ খদ্দের হয়ে যাবো—এই আর-কি।

এই বলে তিনি বিপিনের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন : আপনি কি বলেন বিপিনবাবু ? আমি ঠিক বলেছি না ?

কথাগুলো বিপিনের কানে যাচ্ছিল শুধু। কি করবে, খেতে বসেছিল, খাওয়া ছেড়ে উঠতে পারে না তাই শুনতে হচ্ছিল। জবাব নেহাৎ না দিলে নয়, তাই বললে : তাই হবে হয়ত'।

বিপিনের মনে হচ্ছিল খাওয়াটা তাড়াতাড়ি শেষ করে' উঠে যেতে পারলে যেন সে বাঁচে।

এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা শেষ করে' দেবার জন্যেই বোধ হয় বিপিন বললে, কিন্তু আপনারা সম্ভবতঃ জানেন না ও-গাইটা শুকদেও কেনেনি। ওটা ওর ভাই ভূখন ওকে দিয়ে গেছে।

কথাটা শুনে গোপালবাবু হো হো করে' হেসে উঠলেন। বললেন : শোনো কথা ! সে-ব্যাটা কোথায় কোন একটা তেল-কলের কুলি, সে কিনবে গাই ! ওটা বলতে হয় ! এইটেই হচ্ছে ব্যবসাদারী চাল। দুধের দাম বাকি রাখলে বলবে—ও গাই তো আমার নয় বাবু, ও আমার ভাই-এর গাই। ও-সব ব্যাপার তুমি সহজে বুঝতে পারবে না বিপিন, তুমি ছেলেমানুষ।

বিপিন চুপ করে' রইলো। মনে মনে বোধ হয় সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালে, সে যেন চিরকাল ছেলেমানুষই থাকে ! এই সব ব্যাপার সহজে বুঝবার মত পরিপক্ক বুদ্ধি যেন তাব কোনো দিনই না হয়।

চমৎকার গাই !

ভূখন ভুল বলেনি। প্রথম কয়েকটা দিন দুধ সে একটু কম দিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন সে প্রায় বারো সের দুধ দিচ্ছে দু'বেলায়। ভূখন যা বলেছিল তার চেয়ে বেশী।

তবে তার জন্যে শুকদেওকে আহার-নিদ্রা একরকম পরিত্যাগ

করতে হয়েছে। একা মানুষ, কত দিক সামলাবে? এর আগে গাইটা যেখানে ছিল, পেট ভরে বোধ হয় খেতে পেতো না। এখন তার খাওয়াও যেমন বেড়েছে তার দুধও তেমনি বেড়েছে।

শুকদেও প্রতিজ্ঞা করে, দুধে জল সে কোনোদিন দেবে না। খাঁটি দুধ বিক্রি করবে সে।

কিন্তু সবই তো হ'লো, ভূখন কোথায়? গাই দেবে বলেছিল, বলেই কি সে গাইটি এখানে রেখে দিয়ে গেল?

যতই দিন যেতে লাগলো, ভূখনের চিন্তাটাই তার কাছে প্রবল হয়ে উঠলো।

শেষে একদিন যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে সে গাই নিয়ে এসেছিল তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবেই নিজে এসে হাজির হ'লো।

একা এলো না। সঙ্গে এলো সখিয়া।

সম্পত্তির মধ্যে একটি টিনের তোরঙ্গ আর একটি বিছানা। শুকদেও কিছুই ভাল বুঝতে পারলে না। সখিয়া সম্বন্ধে যে-সব কথা সে শুনে এসেছে, তাকে দেখে তা মনে হয় না।

সখিয়া দেখতে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, তরুণী। মুখে হাসি যেন তার লেগেই আছে।

এখানে এসেই সে কোমরে কাপড় বেঁধে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। গাই-এর সেবা করছে, রান্না করছে, খেতে দিচ্ছে।

শুকদেও-এর কাজ অনেকটা কমে গেছে। দুধের খরিদ্দার সে নিজে করেছে। কাজেই দুধটা দু'বেলা তাকে নিজে গিয়ে বাড়ী বাড়ী দিয়ে আসতে হয়।

শুকদেও-এর সব চেয়ে বড় ভাবনা ছিল, এখানে সখিয়া থাকতে পারবে না। কিন্তু থাকতে না পারার কথা তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না একটিবারও।

তবে একটি কথা শুকদেও-এর মনকে দিনরাত পীড়া দিচ্ছে, অথচ কথাটা সে মুখ ফুটে ভুখনকে জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না। ভুখনও সে সম্বন্ধে কোন কথাই তাকে বলছে না।

অথচ দু'খানি ঘরের মধ্যে একখানি ঘর তার নিজের, আর যে-ঘরে সে কাঠ-কয়লা রাখতো, সেই অন্ধকার নোংরা ঘরখানি একটু পরিষ্কার করে' নিয়ে সেই ঘরে তারা দু'জন—ভুখন আর সখিয়া—রয়েছে ঠিক স্বামি-স্ত্রীর মত একত্রে।

তাদের বিয়ে কখন হ'লো ?

তা যদি না হয়ে থাকে তো এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হ'তে পারে ? হোক্ সহোদর ভাই, এ-অপরাধ সে ক্ষমা করবে না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি করি করেও তার জিজ্ঞাসা করা হয়ে উঠছে না। সব সময়েই তার মনে কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্ক। যদি সে বলে, তারা অবিবাহিত !

দুধের দাম নগদ পাওয়া যাচ্ছে খুব সামান্যই। সবার সঙ্গেই মাস-কাবার বন্দোবস্ত। কাজেই গাই-বাছুরের যা কিছু খরচ—সবই এখন শুকদেও চালিয়ে যাচ্ছে তার সঞ্চিত অর্থ থেকে। মাসের শেষে দুধের দাম আদায় হবে, তখন একটা হিসেব করে' ভুখনের পাই-পয়সা সে বুঝিয়ে দেবে।

ভুখন কিন্তু আজকাল কাজ-কর্ম্ম কিছুই করে না। সারাদিন গাইটার পেছনে লেগে থাকে। সখিয়ার সঙ্গে গাই-বাছুরের সেবা-যত্ন করে, আর সখিয়া যখন যা বলে বাজার থেকে তাই এনে দেয়।

সখিয়ার টাকা-পয়সা আছে নিশ্চয়ই ! নইলে কাজকর্ম্ম না করে' বাড়ীতে বসে থাকবার সাহসই বা সে পায় কোত্থেকে ?

শুকদেও ভেবে কোথাও কিছু কূল-কিনারা পায় না। এক এক

সময় মনে হয়, তবে কি ভূখন তার দুষ্কর্ম্মের সমর্থন পাবার জন্য শুকদেওকে একটা গাই আর বাছুর এনে দিয়েছে।

শুকদেও প্রায়ই ভাবে নিজে যখন এ-ব্যাপারের কোনও মীমাংসাই করতে পারছে না, তখন একবার সে বিপিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করবে—কি তার করা উচিত। এখানে এতগুলি লোকের মধ্যে একমাত্র বিপিনবাবুকেই মনে হয় যেন খাঁটি মানুষ।

কয়েকটা দিন পর সেদিন অপরাহ্নে এই বাড়ীটার ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে গিয়ে ব্রজকিশোরবাবু একবার আছাড় খেলেন।

শব্দটা হয়েছিল একটুখানি অস্বাভাবিক রকমের। শুনেই তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো খোঁড়া দয়াময়।

ব্রজকিশোরবাবুর এইটেই বোধ করি সান্ধ্যভ্রমণে বেরোবার সময়! সেদিন তাঁর পানের মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত হয়েছে ব'লেই মনে হ'লো। টলতে টলতে তিনি দয়াময়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কি খবর?

মুহূর্ত্তের মধ্যে দয়াময় গলে যেন জল হয়ে গেল। ঘাড় বাঁকিয়ে হাতজোড় করে' প্রথমে একটি নমস্কার করলে। তারপর বিনয়-নম্র কণ্ঠে জবাব দিলে, হুজুরের চরণের তলায় একরকম কেটে যাচ্ছে দিনগুলো।

ব্রজকিশোরবাবু তাঁর পা'দুটো কিছুতেই সোজা রাখতে পারছিলেন না। টলতে টলতে পাশের দেওয়ালটা ধরে কোনরকমে টাল সামলে নিয়ে বললেন, শুকদেও একটা গাই এনেছে দেখেছেন?

দয়াময় বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো দিনরাত দেখতে পাচ্ছি।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, দুধ খাচ্ছেন?

দয়াময় বললে, আপনার আশীর্ব্বাদে দুবেলা ভাত খেতে পাচ্ছি

এই যথেষ্ট, এর উপর দুধ খেতে হ'লে আপনার আশীর্ব্বাদের আর একটু জোর হওয়া চাই।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, দুধটা কিন্তু খাঁটি। জল দেয় না।

আপনার দুধে হয়ত না দিতে পারে, আমরা নিলেই দেবে।

ব্রজকিশোরবাবু তাঁর হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আর একটা সিগারেট বের করবার জন্যে পকেটে হাত দিলেন।

জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা দয়াময় তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নিলে। বললে, এতটা বরবাদ ?

ব্রজকিশোববাবু আর একটা আস্ত সিগারেট দয়াময়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, কুড়িয়ে খাবার দরকার নেই। নিন্।

বলেই ব্রজকিশোরবাবু এগিয়ে গেলেন। কোথাও যাবার জন্য তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, এতক্ষণ পরে বোধ হয় সেই কথাটা তার মনে পড়লো।

বাইরের বড় রাস্তায় যেতে হ'লে সাঁকোর মত একটা সুড়ঙ্গের ভেতর প্রবেশ করতে হয়। তারপর কোনরকমে মরি বাঁচি করে' সেই সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করতে পারলেই সুমুখে দেখা যায়, কলকাতার প্রশস্ত রাজপথ।. একে তো দিনের বেলাতেও এই সুড়ঙ্গটা মনে হয় অন্ধকার, তার ওপর তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পথের আলো তখনও জ্বলেনি। কাজেই এই পথটুকু তিনি যে কেমন করে' পার হয়ে এলেন সেকথা তিনিই জানেন। তিনিই এ বাড়ীর মালিক, সুতরাং যেমন করেই আসুন কারও কাছে নালিশ করবার কিছু নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে ব্রজকিশোরবাবু একখানা ট্যাক্সির জন্য এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছিলেন। ট্যাক্সির কোনও সন্ধানই মিললো না।

দয়া করে' একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবার জন্য কাকেই বা অনুরোধ করেন! একজন বৃদ্ধ নাপিত একটা চট বিছিয়ে তার সাজসরঞ্জাম

নিয়ে বসে আছে। হিন্দুস্থানী কুলি মজুরেরা দিনের শেষে এই সময়টায় ছুটি পায়, কাজেই তাদের ক্ষৌরকর্ম্ম করবার এইটেই উপযুক্ত সময়। তারই পাশে বসে আছে এক হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা—মাটির একটা পাত্রে কাঠকয়লা খানিকটা জ্বালিয়ে তাইতে ভুট্টা পুড়িয়ে বিক্রি করছে।

কাউকে না পেয়ে ব্রজকিশোরবাবু সুমুখের ঘরে একবার উঁকি মারলেন। বললেন, ও মশাই, আপনাদের এ পথে ট্যাক্সি চলে নাকি? ট্যাক্সি একটা ডেকে দিতে পারেন?

ভেবেছিলেন, ঘরটা দয়াময়ের।

ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বিপিন। বললে, আপনি, বসুন ভেতরে। ট্যাক্সি আমি ডেকে দিচ্ছি।

বিপিন চলে গেল ট্যাক্সি ডাকতে। ব্রজকিশোরবাবুর পক্ষে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, তিনি ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলেন। দেখলেন ঘরখানি চমৎকার সাজানো। তাছাড়া এমনভাবে মেরামত করা হয়েছে, এ-ঘর যে এই বাড়ীরই একখানি ঘর, দেখলে সেকথা মনে হয় না। ঘরে অনেকগুলি বই রয়েছে। অন্য সময় হ'লে বইগুলো নেড়েচেড়ে তিনি দেখতে পারতেন, কিন্তু এ সময় দেখা না দেখা দুই-ই সমান। বড় বড় মানুষগুলোই এ সময় ঝাপসা হয়ে আসছে, ছোট ছোট বই-এর অক্ষর এখন তিনি পড়তেও পারবেন না।

বেশীক্ষণ তাঁকে বসে থাকতে হ'লো না। বিপিন ট্যাক্সি নিয়ে এলো। বললে, উঠুন, ট্যাক্সি এসেছে।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম—এ ঘরখানা আমাদের এই যে ওই কি নাম—এক্ষুণি কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে—খোঁড়া মানুষ, দুটো ক্রাচ নিয়ে—

আর কিছু বলবার প্রয়োজন হ'লো না। বিপিন বললে, দয়াময়।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, হ্যাঁ দয়াময়। কিন্তু আপনাকে তো কই দেখিনি একদিনও ?

বিপিন বললে, আমি সত্যি নগণ্য ব্যক্তি, একধারে পড়ে থাকি, তাই আমার দিকে কারও নজর পড়ে না। আপনিও দেখেছেন, ভুলে গেছেন।

ব্রজকিশোরবাবু চীৎকার করে' উঠলেন। বললেন, নেভার। আমি যাকে একবার দেখি, তাকে সারা জীবনে ভুলি না। আপনি ভুল বলছেন।

বিপিন দেখলে, তাঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। বললে, তা হবে। হয়ত আমারই ভুল। আপনার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনি উঠুন।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

বিপিন বললে, না না সে কি কথা ! বসুন আপনি। ট্যাক্সিটা আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, থাক্ তাহ'লে, কালই আপনার সঙ্গে এর একটা বোঝাপড়া করবো। আমার মেমারি অত্যন্ত সার্প মশাই। আমার নামে ও দোষ দিলে চলবে না, বুঝলেন ? আমি বনেদী বংশের ছেলে। আসি, নমস্কার।

টলতে টলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন। তারপর ড্রাইভারকে কি যে বললেন, কোথায় গেলেন ভগবান জানেন।

বিপিন আবার তার ঘরে এসে বসলো।

সেদিন রাত তখন প্রায় দু'টো কি তার চেয়ে কিছু বেশীই হবে।

এত বড় বাড়ীটার ভেতরের দিক্‌টা একেবারে নিঝ্‌ঝুম। শুধু বাইরের দিকে বড় রাস্তার মুখোমুখি কয়েকখানা ঘর বেশ সরগরম। দিনের বেলা এ ঘরগুলো খালিই পড়ে থাকে। এ-সব ঘরে এখন নিশাচর মানুষের একাধিপত্য। রাস্তার ওপর গাড়ী-ঘোড়ার আওয়াজ কমে এসেছে। দু-একটা রিক্‌শা গাড়ীর ঠুং-ঠুং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

বিপিন জেগে ছিল তখনও। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে বুকের নীচে একটা বালিশ রেখে তখনও সে একমনে লিখে চলেছিল।

হঠাৎ একটা আওয়াজ তার কানে এলো। মনে হ'লো যেন কোনও মানুষের অস্পষ্ট এবং অস্বাভাবিক গোঙানির শব্দ! বিপিনের লেখা গেল বন্ধ হয়ে। হাতের কলম ফেলে সে উঠে দাঁড়ালো।

ঘরের বাইরে এসে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে বিপিন।

বাড়ী মেরামতের অবশিষ্ট স্তূপ তখনও তেমনি পড়ে আছে। ইট-পাটকেল আর নানা রকমের আবর্জ্জনা উঠোনময় ছড়ানো। বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ তার নাকে এলো। আবর্জ্জনার স্তূপের অন্তরালে হয়ত বা কেউ মরা ইঁদুর দিয়েছে ফেলে।

এখানে-ওখানে অনেকগুলি মানুষ ও জানোয়ার পাশাপাশি শুয়ে আছে। তাদেরই ভেতর ঘুমের দুঃস্বপ্ন দেখে কেউ ককিয়ে উঠেছিল কিনা, তাই-বা কে জানে?

শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না।

বিপিন কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। ঘরের ভেতর থেকে টর্চ্চ-বাতিটা নিয়ে এলো।

টর্চ্চের তীব্র আলো চোখে লাগতেই একটা খাটিয়ার তলা থেকে

তিনটি নেড়ি কুকুরের ছোট ছোট বাচ্চা বিপিনের পায়ের কাছে এসে কুঁই-কুঁই করতে লাগলো। বিপিনের মনে পড়লো কয়েক দিন আগে বড় রাস্তার ওপর একটা কুকুর চাপা পড়েছিল মোটরগাড়ীর চাকার তলায়। এরা বোধ হয় সেই হতভাগীর সন্তান—মাতৃহীন এবং ক্ষুধার্ত্ত।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই আবার সেই শব্দ।

এবার আর তার ভুল হ'লো না। টর্চ্চের আলো ফেলে ফেলে এগিয়ে গিয়ে দেখলে, এই বাড়ীর ভেতরে যাবার স্নুড়ঙ্গের মত খিলান দেওয়া প্রবেশ-পথে প্রত্যহ যেমন থাকে সেদিনও তেমনি বেওয়ারিশ ষাঁড়টা শুয়ে আছে, আর তারই গায়ে বেমক্কা হোঁচট্ খেয়ে কে একটা লোক হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে গেছে।

লোকটির কাছে গিয়ে তার মুখের ওপর আলো ফেলতেই মানুষটিকে চিনতে পেরে বিপিনের বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না। তিনি আর কেউ ন'ন, এই গৃহের গৃহস্বামী স্বয়ং ব্রজকিশোরবাবু। আজই সন্ধ্যায় বিপিন তাঁর জন্য ট্যাক্সি এনে দিয়েছিল।

এক হাতে টর্চ্চ নিয়ে এক হাত দিয়ে ভদ্রলোককে টেনে তোলা অসম্ভব! টর্চ্চটা পকেটে রেখে বিপিন দু'হাত দিয়ে তাঁকে প্রাণপণে টেনে তুলে বসিয়ে দিলে। বললে, আর কেন, উঠুন এবার।

বিপিন বেশ জোরে জোরে তাঁকে বার কতক ঝাঁকানি দিতেই মনে হ'লো যেন তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এলো। জড়িতকণ্ঠে বললেন: Who are you? Who a-r-e you?

বিপিন বললে, এই যে দেখছি টনটনে জ্ঞান রয়েছে! চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বলেই বিপিন তাকে অতি কষ্টে তুলে নিজের কাঁধের ওপর তাঁর একখানা হাত ঘুরিয়ে ধরে চলবার ইঙ্গিত করতেই তিনি বললেন, এখনও মাতাল হইনি বাবা! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

ব্রজকিশোরবাবু মারলেন বিপিনকে এক ধাক্কা। ধাক্কা মেরে নিজেই টাল সামলাতে না পেরে দেয়ালের গায়ে আছাড় খেলেন। বললেন, থানায় নিয়ে যাবে? No, I shall never go to thana. সবুর। বলেই তিনি তাঁর পকেট থেকে বের করে' ফেললেন তাঁর মণিব্যাগটা। তারপর মণিব্যাগটা তিনি বিপিনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "লে যাও, ভাগো! জান্‌তা হ্যায়—আমি কোন্ হ্যায়? আমি তোমার বাপ হ্যায়। কলকাত্তাকো বুনিয়াদী জমিদার হ্যায়।"

বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষায় জড়িয়ে জড়িয়ে এমনি সব কত কি বলতে বলতে তিনি দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু দেয়ালের একটা শেষ আছে সেটা তিনি টের পাননি। টের পাবার মত অবস্থা তাঁর নয়। কাজেই আর একবার তাঁকে আছাড় খেয়ে পড়তে হ'লো।

এবার কিন্তু পড়াটা একটু প্রচণ্ড রকমের হয়ে গেছে। চোট বেশ ভালই লেগেছে বলে মনে হয়।

লাগুক। বিপিন তাঁকে এবার ইচ্ছে করেই ধরেনি। শাস্তি তাঁর পাওয়া উচিত।

বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নেশা করে' যাঁদের তৃপ্তি হয় না, চাবুক মেরে কেউ যদি তাঁদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন, তাহ'লেও বোধ করি তার পাপ হয় না।

বিপিন বুঝতে পারলে, এ অভ্যাসটি ব্রজকিশোরবাবুর বহুদিনের। তা না হ'লে এই অবস্থায় তিনি বাড়ী ফিরে আসতে পারতেন না। কথাবার্ত্তা শুনে তার মনে হ'লো, থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া, থানার হাজত-ঘরে রাত্রিবাস ইত্যাদি কর্ম্ম তাঁর বহুবার হয়ে গেছে এবং এই সবের অভিজ্ঞতা তাঁর এত বেশী আনন্দদায়ক যে, এই রকম প্রকৃতিস্থ

অবস্থাতেও পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে' ছুঁড়ে ফেলে দিতেও তিনি বিস্মৃত হ'লেন না !

যাই হোক, এই রকম ভাবে ইটের গাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবেন এত রাত্রে—সেটাও কেমন ভাল দেখায় না।

বিপিন তাঁকে আবার একবার তুলে ধরে বললে, এবার যদি আপনি আমার কথা না শোনেন, তাহ'লে সারারাত আপনাকে এইখানেই পড়ে থাকতে হবে। আর আপনার বাড়ীর এই এত ভাড়াটে—যারা আপনাকে শ্রদ্ধা সম্মান করে তারা দেখবে—আপনি এই আস্তাকুঁড়ে পড়ে আছেন।

কিন্তু কেই-বা বলছে, আর কেই-বা শুনছে !

ব্রজকিশোরবাবু আবার চীৎকার করে' উঠলেন, হাম নেহি যায়েগা।

মনে পুলিশের ভয় ষোলো আনা ! থানায় ধরে নিয়ে যাবে, হাজতে পূরে দেবে, মার-ধোর করবে !

রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। মাতালের সঙ্গে চীৎকার করতে ভালও লাগছে না বিপিনের। অথচ এই অবস্থায় তাঁকে ফেলেও যেতে পারছে না।

বিপিন জোর করে' তাঁকে তুলে ধরলে। বেশ ভাল করে' একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, থানায় নয়, থানায় নয়, বাড়ীতে এসেছেন আপনি।

ইটের ওপর আছাড় খেয়ে নেশাটা বোধ করি ছুটে এসেছিল। বললে, বাড়ী? No,—I have no home !

বিপিন এবার আর না হেসে থাকতে পারলে না। বিপিন হাসে না তো হাসে না, আবার হাসে যখন, তখন খুব জোরে জোরে হো হো করে' হেসে ওঠে।

জনমানবের সাড়াশব্দহীন এই প্রকাণ্ড ব্যারাক-বাড়ীর নিরন্ধ্র অন্ধকারের মাঝে জেগে রয়েছে তারা মাত্র দু'জন।

এ অবস্থায় ব্রজকিশোরবাবুকে তাঁর দোতলার ঘরে কেমন করে' পৌঁছে দেবে বিপিন সেই কথাই ভাবছিল।

এখান থেকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত কোনরকমে না হয় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া চলবে, কিন্তু সিঁড়িতে তোলাই হবে বিপজ্জনক।

এ সময় আর একজন পেলে মন্দ হয় না।

শুকদেওকে বিপিন যদি ডাকে তো এক্ষুণি সে হয়ত উঠে আসতে পারে কিন্তু ব্রজকিশোরবাবুর জ্ঞান যখন ফিরে আসবে তখন তিনি লজ্জিত হবেন।

অত বড় একটা মানুষকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত নিয়ে যেতেই বিপিন একেবারে গলদঘর্ম্ম হয়ে গেল। সিঁড়ির নীচে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে বিপিন ভাবছে কি করবে, এমন সময় হঠাৎ চুড়ির শব্দে সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখে সিঁড়ির কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

অন্ধকারে মেয়েটিকে ভাল দেখা গেল না। বিপিন বুঝতে পারলে —এই তাঁর সহধর্ম্মিণী। ভালই হ'লো। যাঁর সম্পত্তি তাঁরই হাতে সমর্পণ করে' দিয়ে এবার সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'তে পারছে কই? তাঁরও তো সেই একই সমস্যা! তিনিই বা তাঁকে সিঁড়িতে তুলবেন কেমন করে'?

অথচ একটি কথাও তিনি বলছেন না মুখ ফুটে! বিপিনও অত্যন্ত লাজুক ছেলে। অপরিচিতা ভদ্রমহিলার সঙ্গে উপযাচক হয়ে নিজেও কিছু বলতে পারছে না।

এরকম করে' চুপচাপ দাঁড়িয়েও থাকা যায় না।

বিপিন আগে কথা বললে। বললে, এক ঘটি জল আনতে পারেন? মাথায় ঢেলে দিই। নেশা না ছুটলে সিঁড়ি দিয়ে তোলা যাবে না।

বিপিন অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখতে পাচ্ছে না। সিঁড়িতে আলো নেই। মেয়েটি কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন, জল আনতে গেলেন না।

এরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় বিপিন কখন পড়েনি। বিপিন আবার বললে, জল আনতে গেলেন না ?

মেয়েটি এতক্ষণ পরে জবাব দিলেন। বললেন, তার চেয়ে আপনি আর একবার চেষ্টা করে' দেখুন। খুব জোরে জোরে ঝাঁকানি দিন, তাহ'লেই উঠবে।

এতক্ষণ বোধ হয় তিনি চিন্তা করছিলেন। ভাবছিলেন হয়ত অপরিচিত এই লোকটির সঙ্গে কথা বলা তাঁর উচিত কি না।

তিনি মিথ্যা বলেননি। বিপিন আর একবার জোর করে' ঝাঁকানি দিতেই ব্রজকিশোরবাবু মাথা তুলে কি যেন বললেন, তারপর দেয়াল ধরে নিজেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন।

বিপিন তাঁকে ধরে ধরে সিঁড়িটা কোনরকমে পার করতেই বারান্দার রেলিং ধরে ধরে নিজের ঘরের ভেতর তিনি নিজেই ঢুকে পড়লেন।

এতক্ষণে ঘরের আলোয় তাঁর স্ত্রীকে দেখা গেল। মেঝের ওপর একটি বিছানা পেতে দিয়ে তিনি ঘরের এককোণে সরে দাঁড়িয়েছেন। রোগা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, গায়ের রং ফর্সা, চোখ দু'টি ঢলঢলে, মুখখানি অতি সুন্দর। এক কথায় পরমা সুন্দরী বলা চলে।

সর্ব্বনাশ! এমন সুন্দরী স্ত্রী যাঁর, তিনি মদ্যপান করেন কোন্ দুঃখে ?

ব্রজকিশোরবাবুর ওপর বিপিনের রাগ হ'তে লাগলো।

পায়ের বুট জুতো না খুলেই তিনি তখন শুয়ে পড়েছেন। শরীরের আধখানা মাটিতে, বাকি আধখানা বিছানায়। এতক্ষণ যে রকম ভাবে

ভূমিশয্যা গ্রহণ করে' মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে এলেন, শয্যার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

ব্রজকিশোরবাবুর স্ত্রী বললেন, আপনি এত রাত্রে এত কষ্ট করলেন, আপনাকে আমি কি বলে—

বাকি কথাটা বিপিন তাঁকে শেষ করতে দিলে না। বললে, থাক্, আর বলতে হবে না। আমি জেগেছিলাম তাই, নইলে আজ উনি ওই পথের ওপরেই রাতটা কাটাতেন।

তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি তখন জল আনতে বললেন, আমি আনলাম না,—আপনি কিছু মনে করবেন না। এত রাত্রে মাথায় জল দিতে সাহস হ'লো না। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ-বিসুখ হয়ে যেতে পারে।

এ কথার জবাব দেওয়া যায় না।

বিপিন তার পকেট থেকে ব্রজকিশোরবাবুর মনিব্যাগটি বের করে' তাঁর পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে ঃ এইটে তখন উনি আমাকে ঘুষ দিয়েছিলেন। আমি যখন ওঁকে তুলে ধরে এখানে আনবার চেষ্টা করছিলাম তখন উনি আমাকে ভেবেছিলেন পুলিশের লোক—থানায় ধরে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করছি।

তাঁর স্ত্রী একটুখানি হাসলেন। মুক্তোর মত চমৎকার দাঁতগুলি দেখা গেল।

বিপিন হাত দু'টি জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে বললে ঃ আসি। নমস্কার।

তাঁকে আর কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়েই বিপিন নীচে চলে এলো।

এই ঘটনার পর, একটা ভারি মজার ব্যাপার বিপিন লক্ষ্য করতে লাগলো।

প্রায় প্রত্যহই দেখে, ব্রজকিশোরবাবু যেন বিপিনকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। পাছে চোখাচোখি হয়ে যায় এই ভয়ে কোন্ সময় যে তিনি বিপিনের দরজাটা পার হয়ে চলে যান—বুঝতেই পারা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা গেল ব্রজকিশোরবাবু বিপিনের ঘরে এসে ঢুকলেন। এসেই বললেন, নমস্কার।

বিপিন প্রতি নমস্কার করে' বললে, বসুন।

ভেবেছিল, সেদিনের সেই ব্যাপারটা তাঁর হয়ত মনে না থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মুখে শুনে আজ বোধ হয় তিনি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে এসেছেন।

কিন্তু সেদিনের কোনও কথা তিনি একেবারেই তুললেন না। কোনরকম ভণিতা না করেই সোজা বলে বসলেন, উঠুন। আপনাকে আসতে হবে আমার সঙ্গে।

বিপিন একটু অবাক্ হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে, কোথায় যেতে হবে ?

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, এখানে—এই ঘরে থাকা আপনার চলবে না। আজ থেকে আপনাকে থাকতে হবে আমার সঙ্গে দোতলায়। একটা ঘর আমি আপনার জন্যে ছেড়ে দিয়েছি।

সর্ব্বনাশ ! বিপিন অত্যন্ত নির্ব্বিরোধী মানুষ। একটুখানি লাজুক প্রকৃতির। একা থাকতেই সে ভালবাসে। নিজে তাই একা একখানা ঘর নিয়ে বাস করে। খায় দয়াময়ের 'ইম্পিরিয়াল বোর্ডিং হাউসে'।

দোতলায় যে-ঘরটা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন বলছেন, হয়ত-বা সেই ঘরেই সে কিছুদিন আগেও ছিল। কিন্তু এখন সেটা আর তার নিজের নয়। সেখানে থাকতে হ'লে থাকতে হবে ব্রজকিশোরবাবুর অতিথি হয়ে।

কিন্তু কেন ?

একটি রাত্রির মাত্র একটুখানি উপকার ! উপকার মানুষ মাত্রেরই করা উচিত—তাই সে করেছে। এজন্য এতখানি কৃতজ্ঞতা স্বীকার তিনিই বা করতে যাবেন কেন, আর সে-ই বা তা গ্রহণ করবে কোন্ অধিকারে ?

বিপিন বললে, না না, এ কি কথা বলছেন আপনি ? আমি এখানে বেশ ভালই আছি। আপনাকে কিছু কবতে হবে না।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, আমি কে মশাই, আমাকে এ-সব কথা কেন বলছেন ? আমি আজ্ঞাবহ মাত্র।

বলেই তিনি হাসতে হাসতে পকেট থেকে একটা সিগাবেট বেব করে' নিজে ধবালেন আর একটি সিগাবেট বাড়িয়ে ধরলেন বিপিনেব দিকে।

সিগাবেটটি নিয়ে বিপিন তাঁব মুখেব পানে তাকিযে দেখলে।

সেদিন বাত্রে চেতনাহীন যে মদ্যপকে সে অতি কষ্টে দোতলায তুলে দিয়ে এসেছিল, এই মানুষটি যেন সে মানুষ নয—এমনি তার ভ্রম হ'তে লাগলো।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে তিনি আবাব বললেন, সিগারেটটা খেযে নিন, নিয়ে চলুন আমাব সঙ্গে। যা বলবাব সেইখানেই বলে আসবেন।

বিপিনকে যেতে হ'লো বাধ্য হযে।

ব্রজকিশোরবাবুর স্ত্রী বোধ কবি অপেক্ষা কবছিলেন তাবই জন্য। বিপিন যাওয়া মাত্র ঈষৎ হেসে বললেন, আসুন।

সেদিন রাত্রে যাঁকে সে তেমন ভাল করে' দেখতে পায়নি, আজ সে তাঁকে বেশ ভাল করেই দেখলে। দেখলে, নিতান্ত সাদাসিধা শাড়ী

আর একটি আঁট-সাঁট জামা গায়ে দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি ছাড়া দেহের কোথাও সোনাদানার কোনও চিহ্নই নেই। মুখখানি চমৎকার। হাসি হাসি মুখ। একবার দেখলে চিরকাল মনে থাকে।

বিপিনই প্রথমে বললে, এ কি বলে পাঠিয়েছেন আপনি? না না, তা হয় না। আমি এখানে আসব না।

বিপিন ভেবেছিল, এ-কথার প্রতিবাদ তিনি করবেন না। প্রতিবাদ তিনি করলেনও না, কিন্তু যা বললেন, তা যেন বিপিনের কাছে মনে হ'লো আদেশ।

বিপিনের মুখের দিকে তাঁর সেই আয়ত চোখ দু'টি তুলে তিনি শুধু বললেন, আপনাকে আসতেই হবে। পাশের ঘরটা পরিষ্কার করে' দিয়েছি।

বিপিন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ব্রজকিশোরবাবু বলে উঠলেন, হ'লো তো? আমার কথা বিশ্বাস করছিলেন না, চলুন এবার, জিনিসপত্র নিয়ে আসবেন।

বিপিনের মনে হ'লো এ অত্যাচার। কিন্তু সে এম্‌নি মুখচোরা যে, একটা কথাও বলতে পারলে না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে নীচে নেমে যেতে হ'লো জিনিসপত্র আনবার জন্যে।

ব্রজকিশোরবাবু সঙ্গে সঙ্গে আবার নীচে নেমে এলেন। বিপিনকে দোতলায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁরই উৎসাহ যেন সব চেয়ে বেশী।

বিপিন একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ব্রজকিশোরবাবুর মুখ বন্ধ হয়নি। তিনি ক্রমাগত শুধু এই কথাই বলছিলেন যে, নীচের এই নোংরা অন্ধকার ঘরগুলো মনুষ্যবাসের অযোগ্য আর চারিদিকে হিন্দুস্থানী, ধোপা, উড়ে, মালি, ছাগল, গরু, গাধা—এই সব জানোয়ারের সঙ্গে কোনও ভদ্রলোকের বাস করা উচিত নয়। দোতলার

ঘরগুলো যে খুব ভাল তা নয়, তবে উত্তর-দক্ষিণ খোলা—আলো-হাওয়া প্রচুর।

বিপিনের ঘরে ঢুকে ব্রজকিশোরবাবু নিজেই তার বিছানা উল্টে দিয়ে বাঁধবার ব্যবস্থা করছিলেন, বিপিন বললে, আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না। আপনি চুপ করে' বসুন। বোর্ডিং-এর চাকরটা আসুক, সে সব বেঁধেছেঁদে তুলে দিয়ে আসবে।

ব্রজকিশোরবাবু নিরস্ত হ'লেন।

বিপিন বললে, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়ার একটা বিপদ আছে ব্রজকিশোরবাবু।

ব্রজকিশোরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, বিপদ কিসের ?

বিপিন একটু হেসে বললে, ও-সব খাওয়ার অভ্যেস আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। সেদিন যে রকম হয়েছিল, আবার যদি কোনদিন সে রকম কিছু হয় তো আমি তক্ষুণি নীচে চলে আসবো।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন। আমার ওয়াইফ তো ও-সবের একেবারে ডেড্ এগেন্‌স্টে। আর আমিও তার পরদিনই একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে' ফেলেছি।

কিন্তু ব্রজকিশোরবাবুর এই 'ভীষণ প্রতিজ্ঞা'টা যে কি ধরণের, বিপিন তা টের পাচ্ছিল। এবার তিনি বসেছিলেন বিপিনের খুব কাছেই। মুখের গন্ধ তিনি কিছুতেই চাপতে পারলেন না।

বিপিন নিজেই বরং লজ্জিত হয়ে কথাটা চাপা দিলে। বললে, আপনি সব সময় বাড়ীতে থাকেন না। একা আপনার স্ত্রী থাকেন বাড়ীতে। এ অবস্থায় এ রকম ভাবে আমাকে নিয়ে যাওয়াটা আপনার উচিত হচ্ছে না।

ব্রজকিশোরবাবু যেন একটা বলবার মত কথা পেয়ে গেলেন। বললেন, আরে মশাই, রেখে দিন স্ত্রী! স্ত্রীর মত স্ত্রী হয় তো সে

এক কথা—আলাদা। তবে আমার স্ত্রীর গুণ আছে অনেক। দেখবেন কিরকম রান্না করে। রাঁধুনী আমি রাখিনি মশাই। দু'টি মাত্র মানুষ—রাঁধুনী কি হবে বলুন তো? আমার তো একবেলা চারটি খাওয়া। রাত্রিতে প্রায়ই খাই না।

বিপিন দোতলার ঘরে এলো বটে, কিন্তু ব্রজকিশোরবাবু তাঁর সুন্দরী স্ত্রী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন সেকথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারলে না।

অপরিচয়ের সঙ্কোচ দু'দিনেই ঘুচে গেল।

কিন্তু একটা সঙ্কোচ বিপিনের মন থেকে কিছুতেই কাটতে চাইছিল না। ব্রজকিশোরবাবু অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাইরেই থাকেন। তখন বাড়ীতে থাকে মাত্র দু'জন—ব্রজকিশোরবাবুর স্ত্রী আর বিপিন। বাড়ীতে না আছে ঠাকুর, না আছে চাকর। একটা মাত্র ঠিকে ঝি—কখন আসে, কখন চলে যায়, বুঝতেই পারা যায় না।

স্নান করবার জন্য বিপিনকে নীচে নেমে যেতে হয়। দোতলায় স্নানের ঘর একটা আছে বটে, কিন্তু দোতলার কলে জল আসে না। ঠিকে ঝি সমানে স্নানের ঘরে বড় বড় টবে জল ভর্ত্তি করে' দিয়ে যায়। সেই তোলা জলে ব্রজকিশোরবাবুর আর তাঁর স্ত্রীর স্নান থেকে আরম্ভ করে' সারা দিনের কাজ চলে। কাজেই সে জলে ভাগ না বসিয়ে বিপিন নীচে নেমে যায় স্নান করবার জন্যে।

সেদিন যেই সে নীচে নেমেছে, দয়াময় বেরিয়ে এলো তার ঘর থেকে। বললে, কেমন আছেন বিপিনবাবু?

বিপিন বললে, ভাল।

কিন্তু শুধু ভাল কথাটায় দয়াময়ের যেন মন ভরলো না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লোকটি বিপিনের কাছে এসে দাঁড়ালো। বিশ্রী একটা হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, বলি দিনকাল কেমন চলছে?

তার এই হাসিটা বিপিনের খুব খারাপ লাগলো। কথাটার জবাব দিতে ইচ্ছে হ'লো না। কাজেই এমন ভাবে সে চুপ করে' রইলো—যেন কথাটা—সে তার শুনতেই পায়নি।

কিন্তু দয়াময় ছাড়বার পাত্র নয়। আরও খানিকটা এগিয়ে এলো। বললে, জিজ্ঞাসা করছি, জমিদার-গিন্নীর সঙ্গে আপনার কোনও সম্বন্ধ-টম্বন্ধ আছে কিনা!

বিপিন বললে, না।

না বলে এমন ভাবে সে তার মুখটা ফিরিয়ে নিলে, আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহস দয়াময়ের হলো না।

জিজ্ঞাসা করবার সাহস হ'লো না বটে, কিন্তু টিপ্পনি কাটতে কসুর করলে না।

—আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মশাই, নইলে এত লোক থাকতে আপনার ওপর এই নেক্‌নজর কেন? এই কথা বলতে বলতে আবার তেমনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দয়াময় তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

কোনরকমে তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিয়ে বিপিন ওপরে উঠে যাচ্ছিল, মনে হ'লো বৃদ্ধ গোপালবাবু যেন তারই জন্য ওৎ পেতে বসেছিলেন।

বললেন, শুনে বড় আনন্দিত হলাম বিপিনবাবু।

কি সংবাদ শুনে যে তিনি আনন্দিত হয়েছেন সে কথা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। বিপিন বললে, আনন্দিত হয়েছেন বলে ধন্যবাদ। কিন্তু আজ আমি হঠাৎ আপনার কাছে 'বাবু' হয়ে গেলাম কেন বলুন তো?

গোপালবাবু একটু লজ্জিত হ'লেন মনে হ'লো।

বললেন, ভুল হয়ে গেছে। মনে ছিল না। বুড়ো মানুষ তাই সব সময় সব কথা ঠিক—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কত্তার গিন্নীটি খুব সুন্দরী শুনেছি। কথাটা সত্যি ?

বিপিন বললে, হ্যাঁ, সত্যি !—আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ?

বিপিনের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ গোপালবাবুকে স্পর্শও করলে না। তাঁর কৌতূহলের যেন অন্ত নেই। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে ভাব-সাব হয়েছে নিশ্চয়ই ? কথাবার্ত্তা বলে, গল্প-সল্প করে, এই আর কি, এই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

বিপিন বললে, হ্যাঁ তা কবে।

—রান্নাবান্না নিজেই করে। না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিজেই করে।

—উনোনটাও কি নিজে ধরিয়ে নেয় ?

—তা আমি ঠিক জানি না।

বিপিন না জানলেও দেখা গেল, গোপালবাবু ঠিক জানেন। বললেন, বোধ হয় নিজে ধরায় না। ঠিকে ঝি একটা আছে।

স্নান করে' ভিজে কাপড় পরে বিপিন যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, গোপালবাবুর সেদিকে হুঁস নেই। তার কথা যেন ফুরোতেই চায় না। বললেন, ভদ্রলোক বেশ অবস্থাপন্ন শুনেছি, চাল-চলনটা এখনও বড়লোকের মতই রেখেছেন, কিন্তু দেনায়-দেনায় ভেতরটা বোধ হয় ফোঁপরা হয়ে গেছে। তা নইলে বাড়ীতে একটা চাকর, একটা বারোমেসে ঝি আর একটা রাঁধুনী বামুন—এগুলো থাকা উচিত ছিল। —তা তুমি যখন রয়েছো ওর সঙ্গে, ভেতরের খবরটা নিশ্চয়ই পাবো—না কি বল ?

বিপিনের এবার ধৈর্য্যের সীমা বোধ হয় অতিক্রম করেছিল। বললে, হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই পাবেন। স্নান করে' আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

গোপালবাবু বললেন, হ্যাঁ, তাও তো বটে। তা ছাড়া উনি এতক্ষণ হয়ত ভাত বেড়ে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে। যাও, আর দেরি কোরো না।

বিপিন চলে গেল।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে গোপালবাবুর শেষ মন্তব্যটা তার কানে এলো। তিনি আপন মনেই বলছেন—ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়!

বৃদ্ধ গোপালবাবু মিথ্যা বলেননি।

ব্রজকিশোরবাবুর গৃহিণী সেদিন বিপিনের জন্য ভাত বেড়ে সত্যিই অপেক্ষা করছিলেন। কর্তা বেরিয়ে গেছেন সকালে। বলে গেছেন ফিরতে দেরি হবে। বাড়ীতে খাবেন না। কোথায় কোন্ এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ।

বিপিন কাপড় ছেড়ে জামা গায়ে দিয়ে, চুল আঁচড়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, পেছনে নারীকণ্ঠে কে যেন বললে, ওদিকে নয়, এদিকে আসুন।

তাকিয়ে দেখে, তিনিই।

বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। কাজেই তিনি ছাড়া আর কেই-বা হবে!

দেখা গেল, তাঁদের শোবার ঘরের মেঝের ওপর বড় একটি চমৎকার আসন বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেই আসনের সুমুখে পঞ্চোপচার অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রজকিশোরবাবুর স্ত্রী।

একটা জিনিস বিপিন আজ লক্ষ্য করলে—অন্য দিনের চেয়ে যেন একটুখানি স্বতন্ত্র। অপরিচিত একজন যুবকের সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা বলার নারীসুলভ সঙ্কোচ তাঁর ছিল। আজ মনে হ'লো যেন সে

সঙ্কোচটুকুও তিনি সম্পুর্ণরূপে পরিহার করেছেন। নিতান্ত সহজ সুন্দর ব্যবহার। মনে হয় যেন কত কালের চেনা।

প্রথমেই বললেন, বসুন।

বলেই একটা হাতপাখা নিয়ে নিজেও বসলেন সুমুখে। বসে হাওয়া করতে লাগলেন।

বিপিনের সঙ্কোচ কিন্তু তখনও কাটেনি। খেতে বসলো নিতান্ত জড়োসড়ো হয়ে। এত আদর-যত্ন সত্যিই তার ভাল লাগছে না। এমনি যদি ক্রমাগত চলতে থাকে, তাহ'লে সে পালাবে এখান থেকে। ভবানীপুরেই যে তাকে থাকতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কলকাতা শহবের এমন একটা জায়গায় সে চলে যাবে—যেখান থেকে সহজে কেউ তাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

ব্রজকিশোরবাবুর স্ত্রী বললেন, রোজই দেখি আপনি কিছু না খেয়েই উঠে পড়েন। উনি থাকেন কাছে, কিছু বলতে পারি না। আজ যদি আপনি না খেয়ে উঠে পড়েন, আমি কিছু বাকি রাখবো না।

যে কথাটা বলি বলি করেও বিপিন বলতে পারছিল না, আজ সে ফস্ করে' তাই বলে ফেললে। বললে ঃ

'ভাবছি আমি চলে যাব এখান থেকে।'

'কেন ?'

'এত আদর-যত্ন আমার সহ্য হচ্ছে না। আব ঠিক বুঝতেও পারছি না—কেন আপনারা আমাকে এরকম করছেন।'

কথাটা শুনে ভদ্রমহিলার মুখখানি হঠাৎ কেমন যেন একটুখানি ম্লান হয়ে গেল। বললেন, আমার স্বামীর কথা আমি বলতে পারবো না, তবে আমার কথা আমি বলতে পারি। আপনার খাওয়া শেষ হোক, তারপর বলবো। কিন্তু দোহাই আপনার আজ আপনাকে

সব খেতে হবে। আমি আজ শুধু আপনাকে খাওয়াবো বলে একটি একটি করে' রান্না করেছি। না খেলে সত্যিই আমার খুব কষ্ট হবে।

এর ওপর আর কথা চলে না। রান্নাও হয়েছিল চমৎকার! বিপিন একটি একটি করে' সবই খেলে।

মেয়েটির মুখ দেখে মনে হ'লো বিপিনকে খাইয়ে তিনি সত্যিই আনন্দলাভ করেছেন।

বিপিন তার ঘরে বসে সিগারেট টানছিল, ব্রজকিশোরবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন।

বিপিন তার হাতের সিগারেটটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল, তিনি হাঁ হাঁ করে' নিষেধ করলেন। বললেন, না, ও-সব চলবে না। আপনি যেমন খাচ্ছিলেন খান।

বিপিনকে বাধ্য হয়ে সিগারেট টানতে হ'লো।

মেয়েটি বললেন, আপনি বলবার আগেই আজ আমি ভেবেছিলাম আপনাকে সব কথা জানাবো। নইলে সত্যিই তো, আপনি এখানে থাকবেন কেমন করে'?

বিপিন বললে, ব্রজকিশোরবাবুর কথা ঠেলতে পারলাম না তাই এলাম। কিন্তু এসে অবধি—সত্যি বলছি, সব কিছু আমার হেঁয়ালী বলে মনে হচ্ছে।

—হবেই তো! তাহ'লে শুনুন। আচ্ছা প্রথমে বলুন, হুবহু ঠিক একই চেহারার দু'টি মানুষ আপনি দেখেছেন কিনা?

বিপিন বললে, একবার মাত্র দেখেছিলাম—দু'টি মেয়ে। তারা দুই যমজ বোন।

তিনি বললেন, না যমজ নয়, এমনিই।

বিপিন বললে, না, দেখিনি।

—আমি কিন্তু দেখলাম। আমরা দুই ভাই-বোন। আমার

দাদা আর আমি। দাদা আমার চেয়ে মাত্র দু' বছরের বড়। দু'জনে পাশাপাশি একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি, একসঙ্গে পড়েছি ; আমি পড়তুম মেয়েদের স্কুলে, দাদা পড়তো ছেলেদের স্কুলে। বয়সে বড় ছোট হ'লে কি হয়, একই সঙ্গে একই বছর আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলাম। আই-এ পাস করলাম। তারপর বি-এ। দাদাও পাস করলে, আমিও করলাম।

—আপনি বি-এ পাস করেছেন ?

—করেছি। তারপর হ'লো আমার বিয়ে। দাদা কিন্তু বিয়ে করলে না। এতদিন পরে হ'লো আমাদের ছাড়াছাড়ি। বিয়ের পর আমি যখন শ্বশুরবাড়ী চলে এলাম, দাদা কাঁদতে লাগলো ছেলেমানুষের মত। বললুম, কাঁদছো কেন দাদা। কলকাতাতেই রইলাম, তুমি শ্যামবাজারে, আর আমি ভবানীপুরে। রোজই তো দেখা হ'তে পারে! তাই হ'তো। দাদা রোজই একবার করে' আমার বাড়ী আসতো। রোজই দেখা হ'তো। মা ধরে বসলো দাদাকে বিয়ে করবার জন্যে। আমি চলে আসবার পর বাড়ীতে মা একা। দাদার বিয়ে হ'লে তবু একটা বৌ আসে বাড়ীতে। কিন্তু দাদার ধনুক-ভাঙ্গা পণ। বিয়ে সে কিছুতেই করলে না। মা মারা গেলেন। দাদা একা। তবু দাদা বিয়ে করে না! আমি এবার ধরে বসলাম। বললাম, বিয়ে তুমি কেন করছো না বল দাদা! কোনও মেয়েকে যদি ভালবেসে থাকো তো তাই না হয় বল। দেখি চেষ্টা করে'। দাদা হেসে চুপ করে' রইলো। রোজই আমাদের দেখা হ'তো একবার করে' সেকথা বলেছি আপনাকে। হঠাৎ দু'দিন দাদা এলো না। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ওপর প্রকাণ্ড বাড়ী। গেলাম খবর নিতে। গিয়ে দেখি, ঘরে তালা বন্ধ। বাড়ীটার তেতলায় থাকতাম আমরা। একতলা দু'তলা ভাড়া দেওয়া হ'তো। ভাড়াটেরা কেউ কিছুই বলতে

পারলে না। মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমাকে কোনও খবর না দিয়ে দাদা গেল কোথায় ? বাড়ী ফিরে এসে খুব খানিকটা কাঁদলাম। পরের দিন সকালে প্রকাণ্ড এক চিঠি। দাদা লিখেছে মাদ্রাজের মদন-পল্লী থেকে। দাদার টি-বি হয়েছে। হয়েছে অনেক দিন থেকে। কাউকে কিছু জানতে দেয়নি। পাছে কষ্ট পাই বলে। তারপর রোজই সেখান থেকে চিঠি আসতে থাকে। আমিও চিঠি লিখি। সেখানে যাবার জন্যে মন আমার ছট্ ফট্ করে। কিন্তু এই আমার স্বামী, এই আমার সংসার। ছেলে নেই মেয়ে নেই, কাজও নেই, অবসরও নেই। দেখতে দেখতে পাঁচটি মাস কেটে গেল। আমার সেখানে যাওয়া হলো না। দাদাও চাইতো না যে আমি সেখানে যাই। তাই যাব বলে চিঠি লিখলেই দাদা জানাতো সে ভালই আছে, আর কয়েকদিন পরেই কলকাতায় ফিরে আসবে। সেই দাদী আমার আব ফিরে এলো না। আমাব সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল।

মেয়েটির ছ'চোখ বেয়ে জলেব ধারা গড়িয়ে এলো।

তাঁর সে কান্নাও থামে না। কথাও বলতে পারেন না।

আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছেন। আবার দর দর করে' গড়িয়ে আসে।

সামলাতে অনেকক্ষণ লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে আবার বলতে লাগলেন, সেদিন রাত্রে আপনাকে ভাল করে' দেখতে পাইনি। আমার স্বামীকে নিয়ে দোতলার ঘরে যখন এসে দাঁড়ালেন, আমি আপনার মুখের পানে তাকিয়েই চম্‌কে উঠলাম। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, আমি আপনার সঙ্গে ভাল করে' কথা বলতে পারিনি। কান্নায় আমার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমার স্বামীকে বললাম, ছাখো যদি ওঁকে এখানে আনতে পারো।

আপনি এলেন। তারপর যা কিছু হয়েছে সবই তো আপনি জানেন।

বিপিন বললে, কিন্তু যে আপনার সত্যিকারের দাদা নয়, মা'র পেটের ভাই নয়, রক্তের সম্পর্কে যে কেউ নয়, পারবেন আপনি তাকে আপনার সেই স্নেহময় দাদা কল্পনা করে' ধরে রাখতে ?

তিনি বললেন, পারবো। যাকে ধরবো সে যদি তার মন থেকে আমাকেও সত্যি তার বোন বলে ধরে।

বিপিন বললে, বড় কঠিন পরীক্ষা। পাস করতে পারবো কিনা জানি না। তবে চেষ্টা করবো—এর বেশী আর কিছু বলবার ক্ষমতা আমার নেই।

খানিক থেমে বিপিন আবার বললে, আপনার দাদা আপনাকে কি বলে ডাকতেন ?

তিনি বললেন, প্রথমতঃ আপনি বলতো না, আমার নাম সুহাসিনী। দাদা বলতো, হাসি।

বিপিন বললে, আজ থেকে আমিও তাই বলবো, কিন্তু তুমিও আমাকে······

—যাক্ আর বলতে হবে না। তুমি বলবো, এই তো ?

—হ্যাঁ। তাই বোলো।

গুমোট্ ভাবটা কেটে গেল। এতক্ষণ পরে, বিপিনের মনে হ'লো—এবার যেন সে সহজভাবে চলাফেরা করতে পারবে।

এই ব্যারাক বাড়ীটার ওপরে ওঠবার সিঁড়িটার এ-পাশে একটা জলের কল আর তার সুমুখের যে ফাঁকা জায়গাটার ওপর আখার ছাই, আবর্জ্জনা ইত্যাদি জড়ো করা থাকতো, সেইখানে আজকাল সখিয়ার ভাগলপুরী গাই আর তার বাছুরটা বাঁধা থাকে।

সিঁড়িটার আর এক পাশ দিয়ে সরু লম্বা একটা গলি সুমুখে একটা খোলার বস্তির ভেতর গিয়ে ঢুকেছে।

এই গলিতে তখন বস্তির মেয়েদের ভিড় লেগেছে। রোজই লাগে।

কলে জল এসেছে। বেলা তখন পাঁচটা, কি তার চেয়ে কিছু বেশী হবে।

এদিকের উঠোনে আরও দুটো জলের কল অবশ্য আছে, কিন্তু 'ইম্পিরিয়াল বোর্ডিং হাউসে'র লোকেদেব জ্বালায় সেখানে সহজে কারও জল ধরবার উপায় নেই। কাজেই বস্তির মেয়েরা কতক যায়—বাইরের রাস্তার কলে, আবার কতকগুলো এসে ভিড় জমায় সখিয়ার ঘরের সুমুখে জলের যে-কল, তারই তলায়।

এখানে জল তারা বেশ নির্ব্বিবাদেই নিতো এতদিন। সম্প্রতি এক বিপদ হয়েছে।

সখিয়ার বাছুরটা বাঁধা থাকে তার পাশেই। এতগুলি মেয়ের চীৎকারে গণ্ডগোলে অতিষ্ঠ হয়ে ছোট বাছুর লাফালাফি করতে থাকে। গলাব ঘুঙুর নেড়ে নেড়ে দড়িটা ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে চায়।

ভূখন প্রায় প্রতিদিনই এই মেয়েগুলোকে নিষেধ করে। কিন্তু কেউ তা শোনে না।

সেদিন তখন জল প্রায় সবারই নেওয়া হয়ে গেছে। ক্যাওরাদের কয়েকটা মেয়ে তখনও জল ধরছিল।

ভূখন রুখে উঠে তেড়ে তাদের মারতে এলো।

মেয়েগুলো কিন্তু নাছোড়বান্দা। জল তাবা নেবেই।

ভূখন কিছুতেই তার রাগ সামলাতে পারলে না। বকতে বকতে ফট্ করে' এমন একটা কথা সে বলে ফেললে, যে-কথাটাকে অকথ্য

বলা চলে। যদিও ভাষার মধ্যে কথ্য অকথ্য বলে কোথাও বাধা-নিষেধ তারা মেনে চলে না, তবু তার এই কথাটা মেয়েদের কানে ভাল শোনালো না।

রোগা মেয়েটা দপ্ করে' জ্বলে উঠলো।

হাতের কলসীটা মাটিতে নামিয়ে সে যা বললে, তার সারমর্ম্ম এই যে, সে না হয় সতীলক্ষ্মী নয়ই—সে কথা সবাই জানে। কিন্তু তার নিজের ঘরে কি ? যে সুন্দরী সখিয়াকে ঘরে এনে অহঙ্কারে তার মাটিতে পা পড়ছে না, তার কথাটাই তবে শোন্ !

এই বলে' চেঁচিয়ে গালাগালি দিয়ে হাঁকডাক করে' যখন দেখলে অনেকগুলো লোক সেখানে জড়ো হয়েছে, তখন সে জানিয়ে দিলে—সেদিন সন্ধ্যেবেলা সিঁড়ির নীচের ওই অন্ধকার ঘুপসীমত জায়গাটায় —ওপরেব ওই বাড়ীওলা বাবুর সঙ্গে সখিয়া জাপটা-জাপটি করছিল সে নিজের চোখে তো দেখেইছে, আবও দু'একজনকে ডেকে তাদের এই কাণ্ডকারখানা দেখিয়েও দিয়েছে।

সুতরাং সতীলক্ষ্মী সে একা নয়—তার সখিয়াবিবিও বাদ যায় না।

স্ত্রী বলে যাকে সে তার ঘরে এনে রেখেছে তার নামে এত বড় একটা কলঙ্কের অপবাদ ভূখন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলে না। প্রকাণ্ড একটা চ্যালা কাঠ তুলে নিয়ে মেয়েটাকে মারবার জন্যে সে ছুটে এলো।

মেয়েটাও অতি দজ্জাল মেয়ে। সেও বড় কম যায় না। ভূখনকে আর সখিয়াকে নানারকম অশ্রাব্য কটুকথা বলতে বলতে সে তার কলসী নিয়ে এমনভাবে ছুটে পালিয়ে গেল যে, ভূখন তাকে ধরতেই পারলে না।

সবাই ভেবেছিল ব্যাপারটা এইখানেই বোধ হয় চুকেবুকে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল মেয়েটা আবার এসেছে। এবার

সে একা আসেনি। তারই সমবয়সী কালো কালো আরও হু'জন মেয়েকে সে ধরে এনেছে। গায়ে তাদের শক্তি আছে কিনা কে জানে, ভূখনের সঙ্গে লড়াই বাধলে হারবে কি জিতবে তাও ঠিক বলা যায় না। তবে মুখের ধার যে আছে তাতে কোন ভুল নেই।

কোমরে কাপড় বেঁধে তারা তিনজনে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে তৈরী হয়েই এসেছিল। কিন্তু ঝগড়া তাদের করতে হ'লো না।

তার জন্যে খুব যে তারা হতাশ হয়ে গেল তা নয়। কারণ, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই তারা লক্ষ্য করলে—ভূখন যে ঘরে বাস করে সেই ঘরের দরজায় তখন একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেছে।

দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সখিয়া কাঁদছে আর ভূখন তাকে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তিরস্কার করছে আর বলছে, এ রকম বেইমানী যে করতে পারে তার সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই। গরু-বাছুর নিয়ে সে এক্ষুণি চলে যেতে পারে এখান থেকে।

শুকদেও বাড়ীতে ছিল না। থাকলে কি হ'তো বলা যায় না।

এসেই দেখে মহামারী কাণ্ড। —সখিয়ার যে ইতিহাস সে কিষণ-লালের মুখ থেকে শুনে এসেছে, তা যদি সত্য হয় তো এমনি একটা কেলেঙ্কারী একদিন না একদিন ঘটবেই—সে আশঙ্কা তার মনে মনে প্রতিনিয়তই হ'তো। সত্য যা তাকে চেপে রাখা যায় না।

সব চেয়ে লজ্জার কথা—ভূখন তার সহোদর ভাই।

আজ তার ক্রমাগত এই কথাই মনে হ'তে লাগলো—তবে কি একটা গাই আর কয়েক সের হুধের জন্য ভূখনকে সে ক্ষমা করেছে?

লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

মজা দেখবার জন্য যারা এসে দাঁড়িয়েছিল, শুকদেও হাত হু'টি জোড় করে' তাদের কাছে গিয়ে বললে, আপনারা দয়া করে' এখান থেকে সরে যান।

'ইম্পিরিয়াল বোর্ডিং হাউসে'র বোর্ডার যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা চলে গেলেন। বস্তি থেকে যে মেয়েগুলো এসেছিল তারাও গেল, কিন্তু যাবার সময় একটা মেয়ে ঠোঁট উল্‌টে টিপ্পনি কাটতে ছাড়লে না।

—জায়গাটা তো তোর নয় রে মুখপোড়া!

এই রঙ্গের আসল নায়িকা তিনজন কিন্তু এই দিক্‌পানে সরে এলো মাত্র। রঙ্গমঞ্চ থেকে একেবারে অন্তর্হিতা হ'লো না। তারা দেখলে এইটে উপযুক্ত সময়। ক্যাওরাদের যে-মেয়েটিকে ভূখন মারবার জন্যে তেড়ে এসেছিল তার গলার জোর সবচেয়ে বেশী। সে-ই প্রথমে তার ভাষণ সুরু করলে।

—কেমন, হ'লো তো? হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌লো তো? তেড়ে যে মারতে এলি আমাকে? এইবার মার কাকে মারবি?

হঠাৎ দোতলার দিকে তার নজর পড়তেই এক গাল হেসে বলে উঠলো, বেশ করেছে—আচ্ছা করেছে বড়বাবু। ব্যাটাছেলে—ব্যাটাছেলের মত কাজ করেছে! তুই হলি গিয়ে একটা কুলি-মজুর, তোর মুরোদ কি? তোর কাছে ও থাকবে ক্যান্ রে মুখপোড়া?

শুকদেও ছুটে বেরিয়ে এলো। সবাই ভাবলে বুঝি মেয়েটাকে ও মারবে। কিন্তু মেয়েটার কাছে এসে শুকদেও হাতজোড় করে' বললে, যা মায়ি, যা হবার তা হয়ে গেছে। আর এ কেলেঙ্কারী বাড়াস্‌নে মা, যা। মানী লোক লজ্জা পাবে।

এই বলে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট করে' আবার তার ঘরের দিকে চলে গেল।

ক্যাওরা মেয়েটা অবাক্ হয়ে গেল। শুকদেও-এর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, ছাখ্ রে মুখপোড়া কেমন দাদা ছাখ্!

আর কিছু সে বলতে পারলে না। সঙ্গীদের টেনে নিয়ে এতক্ষণ পরে সে রণে ভঙ্গ দিল।

দয়াময় গিয়েছিল টেনিয়া ধোপানীর কাপড়ের হিসেব লিখতে। এতক্ষণ পরে সে তার ঠেঙ্গো ঠক্ ঠক্ করতে করতে বাসায় ফিরছিল। ব্যাপারটা সে সবই শুনেছে ধোবী মহল্লায়।

গোপালবাবু বোধ হয় সঙ্গী খুঁজছিলেন। দয়াময়কে দেখতে পেয়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, এস এস দয়াময় এস। —এদিকে শুনেছ কি হয়েছে!

দয়াময় ওপরের দিকে তাকালো। বললে, হবে তা জানা কথা।

জানা কথা জানতে আর কারও বাকি রইলো না।

সবাই জানলে,—সবাই শুনলে।

উড়িয়া, খোট্টা, হিন্দুস্থানী, ক্যাওরা, নাপিত, ধোপা, যে যেখানে ছিল সবাই শুনলে, মিস্ত্রিরজি শুনলে, 'ইম্পিরিয়াল বোর্ডিং হাউসে'র লোকগুলি' শুনলে, বাচ্চু শুনলে, বিপিন শুনলে আর শুনলে সুহাসিনী। জমিদার স্বামীর দুষ্কৃতির কাহিনী তারও কানে গিয়ে পৌঁছোতে দেরি হ'লো না।

গল্পের প্রধান পাণ্ডা ব্রজকিশোরবাবু বাড়ীতে ছিলেন না। নইলে তিনিও শুনতেন।

বিপিনের আপাদমস্তক রি রি করতে লাগলো।

ছি ছি, দুশ্চরিত্র এই মদ্যপ পাষণ্ডের সংসারে আসা তার উচিত হয়নি। তার সঙ্গে কোনও সংস্রব কোনও যোগাযোগ রাখা উচিত নয়।

সুহাসিনীর কথা মনে হ'লো। মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়। এই তার স্বামী। এই তার সারা জীবনের সঙ্গী। পুত্র নাই, কন্যা নাই, মনের দুঃখ খুলে বলবার মত একটা মানুষ পর্য্যন্ত নাই। সহোদর ভাই ছিল। সেও চলে গেছে অকালে। তাকেই সে তার দাদা মনে

করে' একটুখানি সান্ত্বনা পেতে চায়! কিন্তু না, কাজ নেই তার এই কল্পনার স্বর্গ-রচনা করে'! মিথ্যার জাল বুনে বৃথা তার শান্তির সন্ধান। বিধাতা যে দুঃখ তাকে দিয়েছেন, সে দুঃখ মোচন করবার সাধ্য তার নেই।

বিপিন মনে মনে সঙ্কল্প করলে। এখান থেকে সে চলেই যাবে।

যাবার আগে সুহাসিনীকে সে একখানা চিঠি লিখে দিয়ে যাবে। এ সময় যতীনবাবুকে পেলে বড় উপকার হ'তো। কি করবে, কি তার করা উচিত—পরামর্শ করতে পারতো। কিন্তু কোথায় তিনি, কবে ফিরবেন—তারও কোনও স্থিরতা নেই।

বিপিন হাত-মুখ ধোবার জন্যে নীচে নেমে গিয়েছিল।

ফিরে এসে দেখে, সুহাসিনী চুপি চুপি তার ঘরে রাত্রে খাবার রেখে দিয়ে কোন্ সময় চলে গেছে। আজ তার সুমুখে এসে দাঁড়াতেও তার লজ্জা হয়েছে।

হওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিপিনের চোখে ঘুম এলো না। ক্রমাগত মনে হ'তে লাগলো, সুহাসিনীকে না জানিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়া তার উচিত হবে না। জানিয়ে যাওয়ারও বিপদ আছে। হয়ত সে সহজে তাকে ছাড়তে চাইবে না।

বাইরে বারান্দায় জুতোর শব্দ হ'লো।

ব্রজকিশোরবাবু এলেন।

বিপিন দেখলে, ঘড়িতে তখন দেড়টা বাজছে। রাত্রি দেড়টা।

আজ তাদের দু'জনের মধ্যে বিশ্রী একটা ঝগড়া নিশ্চয়ই বাধবে। বিপিন পাশের ঘরের দিকে কান খাড়া করে' রইলো। কিন্তু আশ্চর্য্য, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঝগড়া দূরে থাক্, কোনও কথাই শুনতে পাওয়া গেল না।

আগাছার জঙ্গল থেকে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে শুধু।

পরের দিন বিপিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল খুব ভোরে।

যত বেলা বাড়বে নীচের কলে ভিড় লেগে যাবে, তাই সে ভাবলে—এই সময় স্নান করে' নিলে ভাল হয়।

বিপিন স্নান করতে যাচ্ছিল নীচের কলে। যেতে যেতে হঠাৎ সে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলে অন্ধকার সিঁড়িতে আলো আসবে বলেই হোক কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, সিঁড়ির পাশের একটা দেওয়ালের খানকতক ইট সরিয়ে খানিকটা ফাঁক করে' দেওয়া হয়েছে। সেইখানে চোখ রেখে বিপিন দেখলে। সেখান থেকে শুকদেও আর ভুখনের ঘরের ভেতর পর্য্যন্ত নজর চলছে।

কিন্তু সেখানে যা সে দেখলে, তা দেখবে বলে কল্পনাও করেনি। যে-সখিয়াকে ভুখন কাল তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, দেখলে সেই সখিয়া তাদের ঘরের দরজায় তার সেই সবুজ রঙের আঁট-সাঁট জামাটি গায়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে কপাটহীন দরজার চৌকাঠ ধরে সে এক অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, আর ভুখন তাদের কলের নীচে বসে গায়ে সাবান ঘষছে।

ভুখন কি যেন বললে। কথাটা শুনে সখিয়া ফিক্ করে' হেসে লজ্জায় মুখ নীচু করলে। তারপর ভুখন আবার কি একটা কথা বলতেই সখিয়া হেসে হেসে একেবারে যেন লুটিয়ে পড়লো।

এরই মধ্যে তাদের বোঝাপড়া হ'লো কেমন করে' বিপিন ঠিক বুঝতে পারলো না।

বুঝে কাজ নেই।

বিপিন নীচে নেমে গিয়ে সোজা কলের দিকে চলে যাচ্ছিল, পেছন থেকে ডাক শোনা গেল, বাবু!

বিপিন পেছন যিরে দেখে—শুকদেও।

শুকদেও হাত জোড় করে' তাকে একটি প্রণাম করলে। বললে, আপনার সঙ্গে দেখা না করে' তো যেতে পারি না বাবু, তাই অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি এইখানে।

—কেন, ওপরে গেলেই পারতে! আমি এই সামনের ঘরটাতেই থাকি।

শুকদেও বললে, জানি বাবু। তবু যাইনি। বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে উনি লজ্জা পাবেন।

সত্যিই তো! বড়বাবুর লজ্জা-সরমের বালাই নেই, কিন্তু শুকদেও-এর লজ্জা আছে। কথাটা বলা তাকে উচিত হয়নি। এ প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।

শুকদেও-এর কথা শুনে বিপিনের মনে হ'লো তারা এখান থেকে চলে যাবে। যে-ঘটনা ঘটে গেছে, তারপর তাদের।এখানে থাকা সম্ভবও নয়। বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, কবে যাবে?

শুকদেও বললে, আজই। এক্ষুণি।

—বাড়ী ঠিক করেছো?

শুকদেও বললে, বাড়ী কি হবে বাবু, আমি একা মানুষ, যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবো। পাঁচশ' টাকা আমার আছে। তাইতেই আমার বাকি ক টা দিন চলে যাবে।

বিপিন বললে, তুমি একা চলে যাচ্ছো? তোমার ভাই ভূখন, তার বৌ—ওরা কি করবে?

শুকদেও বললে, ওরা থাকবে এইখানে।

বলেই সে এদিক্-ওদিক্ তাকালে। তাকিয়ে দেখে নিলে কাছাকাছি কেউ আছে কিনা। তারপর বললে, বৌটা ভাল নয় আমি জানি। ভূখন ওকে বিয়েও করেনি।। কি করবো বাবু,

সহোদর ভাই, অনেক করে' বুঝিয়ে বললাম—ওকে ছেড়ে দে, কেলেঙ্কারী বাড়াস না, তা ও কিছুতেই শুনবে না আমার কথা। তাই বললাম—তবে থাক্ তোরা এইখানে, আমিই চলে যাই এখান থেকে।

বিপিন বললে, আমিও চলে যাব শুকদেও! এখানে থাকবো না।

শুকদেও ম্লান একটু হাসল। বললে, জানি বাবু আপনার মতন মানুষ, এখানে আপনি থাকতে পারবেন না। আসি বাবু। বলে সে এবার তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার জন্যে হাত দুটো বাড়িয়েছিল, বিপিন দু' পা পিছিয়ে গেল। বললে, না, তোমার প্রণাম নেবার মত লোক আমি নই শুকদেও।

এই বলে বিপিন নিজেই চলে গেল কলের দিকে। মনে মনে বললে, তুমি যে-জাতই হও শুকদেও, তুমিই আমার নমস্য।

স্নান করে' বিপিন তার ঘরে এসে দেখে, টেবিলের ওপর চা আর খানকতক টোষ্ট ঢাকা দেওয়া।

সুহাসিনী নিশ্চয়ই, সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে চলে গেছে।

চা টোষ্ট খেয়ে বিপিন বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

ব্রজকিশোরবাবুর ঘুম বোধ হয় আগেই ভেঙ্গেছিল।

জিজ্ঞাসা করলে, কথাটা ও শুনেছে নিশ্চয়ই।

সুহাসিনী বললে, কান তো আছে, কালা তো নয়!

ব্রজকিশোরবাবু হাসলেন। বললেন, অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়।

সুহাসিনী বললে, কথাটা তোমার কথা যে! কিছুই নয় বললেও বিশ্বাস করবে না।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, আমাদের ভবানীপুরের বাড়ীর পাশে খালি যে জায়গাটা পড়েছিল, সেইখানে গরু, বাছুর, ছাগল এই সব বাঁধতো সুরাইয়া বলে একটা হিন্দুস্থানী মেয়ে। তার এক বোন ছিল

যমুনা। সেই যমুনার মেয়ে সখিয়া। সখিয়ার মা মারা গেল—সখিয়া তখন খুব ছোট। সুরাইয়ার ছেলেপিলে ছিল না, তাই সে সখিয়াকে মানুষ করতো নিজের মেয়ের মত। সখিয়া যখন বেশ ডাগর-ডোগরটি হ'লো, দশ জনের নজরে লাগলো, তখন একদিন তার বুড়ো বাপ এসে হাজির! তার বাপটা থাকতো মাণিকতলায়। বাপ এসে বলে, নিয়ে যাবে সখিয়াকে। সুরাইয়া বলে, দেবে না। এই নিয়ে দু'জনের সে কী ঝগড়া! গাল-মন্দ দিতে কেউ আর বাকি রাখলে না। বাপ বলে, সুরাইয়া ভাল মেয়ে নয়, ওর কাছে মেয়েকে আমি আর রাখবো না। সুরাইয়া বলে, 'মিন্‌সের কারবার চলছে না, খেতে পাচ্ছে না, তাই মেয়েকে নিতে এসেছে রোজগার করাবে বলে'।

শেষ পর্য্যন্ত বাপেরই হলো জিত। সখিয়াকে নিয়ে চলে গেল। সুরাইয়ার নিজের হাতে মানুষ করা মেয়ে, দুঃখ হবার কথাই। মনের দুঃখে সে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এলো—সখিয়ার বাপের নামে নালিশ করবে। উকিল ঠিক করে' দিতে হবে।

আমি তাকে নালিশ করতে দিইনি। নালিশ করে' লাভ হতো না, মিছিমিছি কতকগুলি টাকা খরচ হতো।

তার পর এতদিন পরে সেই সখিয়াকে দেখলুম এখানে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে, তুই এখানে এলি কেমন করে?

সখিয়া ফিক্ করে' হেসে আমার হাতে একটা চড় মেরে দিয়ে চলে গেল। আমি অবাক্ হয়ে গেলাম।

আমি ওর মাসিকে বেশ ভাল করেই চিনি, কাজেই সখিয়াকেও চিনতে দেরি হ'লো না। শুকদেও বললে, ভূখন ওকে নিয়ে এসেছে বাবু। বিয়ে করেছে কিনা বুঝতে পারছি না।

সেদিন বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি সন্ধ্যেবেলা—কি রকম অবস্থায় বুঝতেই পারছো। সিঁড়ির নীচে নামতেই দেখি সখিয়া দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখেই ফিক্ ফিক্ করে' হাসতে লাগলো। আমি তার হাতখানা ধরে ফেললাম। বললাম, খবরটা দেবো নাকি তোর মাসিকে? সখিয়া আমার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে বললে, না বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, বোলো না আমি এখানে আছি।

ব্যস্, কয়েকটা মেয়ে জল নিতে আসছিল, আমরা ছিলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তাদের দেখেই সখিয়া আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

ব্যস্, এই তো ব্যাপার! এর মধ্যে এমন কি আছে যার জন্যে এত বড় একটা হুলুস্থূল কাণ্ড হয়ে গেল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুহাসিনী মন দিয়ে শুনলে সবই, কিন্তু বললে না কিছুই।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, ওকে বলে দিও।

সুহাসিনী কি যেন ভাবছিল। বললে, কাকে?

ব্রজকিশোরবাবু বললে, তোমার দাদাকে।

সুহাসিনী বললে, কাল থেকে আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি না।

—কেন?

—লজ্জায়।

পাঁচটা দিন পার হয়ে গেল। বিপিন কখন যে বাড়ী ফেরে, কখন যে বেরিয়ে যায়—তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সুহাসিনী সবই বুঝতে পারে। সুযোগ পেলেই তার ঘরে খাবার রেখে আসে।

এই রকম ভাবে আর কতদিন চলবে—সুহাসিনী ভাবছিল।

এবার যেন তার অসহ্য হয়ে উঠছে।

আজ সে তার সব লজ্জা সব ভুল ভেঙ্গে দেবে।

সুহাসিনী প্রস্তুত হয়ে রইলো। বিপিন এলে হয়!

বিপিন আজ কয়েক দিন ধরে ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছে শহরের পথে পথে। আজ এ-হোটেল কাল সে-হোটেল! 'বোর্ডিং হাউস' লেখা সাইনবোর্ড দেখেছে কি সেখানে ঢুকে পড়েছে। কি রকম ঘর, কি রকম খাওয়া, কত খরচ জেনে নিয়েছে, আর মনে মনে ভেবেছে তার পোষাবে কি-না।

কোনোটাই কিন্তু তার পছন্দ নয়।

অথচ যে-জায়গায় সে এতদিন ধরে বাস করছে, সে নরক-কুণ্ডের চেয়ে সবগুলিই ভাল।

পছন্দ না হবার কারণ বোধ হয় এখনও তার মন ঠিক বুঝতে পারছে না—সেখানে থেকে এমনি ভাবে চলে আসাটাকে সুহাসিনী কি রকম ভাবে গ্রহণ করবে।

মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা ও প্রীতির মূল্য যে কতখানি বিপিন তা জানে। সেদিক্ দিয়ে তার নিজের জীবন তো মরুভূমি! মানুষ যা অতি সহজেই পায়—বাপ মা ভাই বোনের স্নেহ ভালবাসা—মানুষের যা জন্ম-অধিকার, তা' থেকেও সে আজীবন বঞ্চিত। মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই—এ পৃথিবীতে সে একেবারে একা। বড়লোক এক স্নেহময়ী পিসিমা তাকে অতি শৈশব থেকে মানুষ করেছেন। তাঁরই দয়ায় এখনও সে বেঁচে আছে। এখনও তাঁরই কাছ থেকে মাসে মাসে তার নামে টাকা আসে।

স্নেহ ভালবাসা থেকে আজন্ম বঞ্চিত তার কাঙ্গাল হৃদয়ের কাছে অনাত্মীয়া এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা নারীর অযাচিত স্নেহের মূল্য বড় কম নয়।

তবু সে আজ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়।

শুকদেও তার সহোদর ভূখনকেও কম ভালবাসতো না !

পটলডাঙ্গার একটি ‘বোর্ডিং হাউসে’ নগদ পাঁচটি টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে বিপিন একটি রসিদ নিলে।

বোর্ডিং-এর ম্যানেজার বললেন, আগামী সাতদিনের ভেতর আপনি যদি না আসেন, আপনার এই পাঁচটি টাকা আপনি ফেরত পাবেন না।

বিপিন বললে, আমি আজই আসবো। আজ যদি না আসতে পারি, কাল নিশ্চয় আসবো।

এই বলে সে ভবানীপুরের সেই ‘ইম্পিরিয়াল বোর্ডিং হাউসে’র দোতলায় ফিরে এলো।

ফিরে যখন এলো, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

ভালই হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সে চলে আসতে পারবে। দয়াময় দেখতে পাবে না। বৃদ্ধ গোপালবাবু দেখতে পাবেন না।

কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

সুহাসিনী বোধ হয় রান্নাঘরে। ব্রজকিশোরবাবু নিশ্চয়ই বেড়াতে বেরিয়েছেন।

ঘরে ঢুকে বিপিন প্রথমেই তার বিছানাটা বেঁধে ফেললে। তারপর সুহাসিনীকে একখানা চিঠি লিখতে বসলো।

চোরের মত না বলে পালিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

চিঠিখানা কি বলে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না বিপিন।

লিখলে—সবিনয় নিবেদন। লিখে কেটে ফেলেও তৃপ্তি হলো না। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে আরম্ভ করলে আর একখানা কাগজে। এবার লিখলে—কল্যাণীয়াসু। নাঃ, তাও

ঠিক পছন্দ হলো না তার। এবারও কেটে ফেললে। লিখলে, কল্যাণীয়া সুহাসিনী!

তাও না। এবারও কাগজখানা ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিলে। আবার একখানা চিঠির কাগজে প্রথমেই লিখলে, ভাই সুহাসিনী!

সুহাসিনী নয়। তার ডাক-নাম হাসি। তার দাদা তাকে হাসি বলেই ডাকতো। সুহাসিনী কেটে ফেলে লিখলে, ভাই হাসি।

এবার কি লিখবে তাই ভাবছে। হঠাৎ মনে হলো ঘরে যেন কে ঢুকেছে। পেছনে চুড়ির আওয়াজ।

বিপিন মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখে—সুহাসিনী। হাতে এক পেয়ালা চা।

আমি বুঝতে পেরেছি তুমি এসেছো।—চায়েব পেয়ালাটি হাতের কাছে নামিয়ে দিতেই সুহাসিনীর নজর পড়লো বিপিনেব বিছানাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

বিছানা বাঁধলে কে? তুমি?

সুহাসিনীর মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুচ্ছে না। মনে হলো সে যেন কাঁপছে। এক হাত দিয়ে টেবিলের একটা কোণা ধরে ফেলে সে যেন সাম্‌লে নিলে নিজেকে। ঝুঁকে পড়ে একবার চিঠির কাগজটার দিকে তাকালে। লেখা রয়েছে—ভাই হাসি।

সুহাসিনী চোখ তুলে তাকালে বিপিনের দিকে! নিবিড় বেদনা মাখানো তার সেই আয়ত দুটি কালো চোখ! দেখতে দেখতে সে দু'টি চোখ তার জলে ভরে এলো। ঠোঁট দু'টি থর থর করে' কাঁপতে লাগলো। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলে না।

বিপিনের হাতের কাছে নামানো চায়ের পেয়ালা ঠাণ্ডা হয়ে

যাচ্ছে। খাবার জন্যে অনুরোধ করলে না। অতি কষ্টে সুহাসিনী শুধু উচ্চারণ করলে, এসো !

সুহাসিনী হেঁট হয়ে বিপিনের পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম করলে। বিপিন না পারলে নিষেধ করতে, না পারলে কিছু বলতে। শক্ত পাথরের মত চুপ করে' বসে রইলো শুধু।

সুহাসিনী ঘর থেকে বোধ হয় বেরিয়ে যাচ্ছিল। দোরের কাছে একবার ফিরে দাঁড়ালো। বললে, শোনো !

বিপিন উঠে দাঁড়ালো।

সুহাসিনী বললে, যাবার আগে একটি বার শুধু দেখে যাও !

বিপিন তার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাদের শোবার ঘরে গিয়ে দেখলে, ব্রজকিশোরবাবু খাটের ওপর নির্জীবের মত শুয়ে আছেন। মাথায়—হাতে—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুহাসিনী বললে, ভূখন মেরেছে।

বিপিন বললে, শুকদেও-এর ভাই—ভূখন ?

সুহাসিনী বললে, হ্যাঁ।

বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় মেরেছে ? এইখানে ?

সুহাসিনী বললে, না। রাস্তায়।

অথচ সখিয়ার ব্যাপারে তার স্বামী যে নির্দ্দোষ, সুহাসিনী বিপিনকে সে কথা জানালে না। জানাবার প্রয়োজন মনে করলে না।

বিপিনও আব কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে না। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

নীচে গিয়ে দেখলে, ভূখন নেই, সখিয়া নেই, তাদের গাইও নেই, বাছুরও নেই। শুকদেও তো আগেই চলে গেছে।

ঘরে এসে দেখলে, যে চিঠির কাগজে বিপিন চিঠি ৷লিখছিল সেই

কাগজটির ওপর মাথা গুঁজে সুহাসিনী বসে আছে। তারই পাশে বিপিনের অভুক্ত চায়ের পেয়ালা তখনও তেমনি পড়ে।

ব্রজকিশোরবাবু সেরে উঠেছেন। দিবারাত্রি বাড়ীতেই বসে থাকেন। নতুন একটা চাকর রেখেছেন। হাট বাজার করে, জল তুলে দেয়, ঘরকন্নার খুঁটিনাটি কাজকর্ম্ম সে-ই করে দেয়। বাকি সব কাজের ভার সুহাসিনীর।

সুহাসিনীর মুখের হাসি কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে।

বিপিনকে সে ধরে রাখতে পারেনি। বিপিন চলে গেছে এখান থেকে।

ধরে রাখবার চেষ্টাও সুহাসিনী করেনি।

ব্রজকিশোরবাবু সেদিন ডাকলেন সুহাসিনীকে। বললেন, শোনো।

—কি?

সুহাসিনী কাছে এসে দাঁড়ালো। কি বলছো?

—সেই কথাটা বলেছিলে ওকে?

কথাটা কি এবং কাকে বলতে হবে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হ'লো না। কারণ সুহাসিনীও সেই কথাটাই ভাবছিল দিনরাত। ভাবছিল—তার স্বামী যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এই কথাটা বোধ হয় বিপিনকে তার বলা উচিত ছিল।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারেনি। মুখের কথা মুখেই আট্‌কে গিয়েছিল।

ব্রজকিশোরবাবু আবার বললেন, বলনি?

সুহাসিনী বললে, না।

—কেন?

—জানি না। বলে' সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল সুহাসিনী।

হাত বাড়িয়ে ব্রজকিশোরবাবু তার কাপড়ের আঁচলটা টেনে ধরলেন। বললেন, বল তুমি কেন বলনি !

যে সন্দেহ তিনি করেছিলেন, সুহাসিনী ঠিক সেই কথাই বললে। বললে, ও আমি বিশ্বাস করি না।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, ঠিক এই সন্দেহই আমি করেছিলাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুহাসিনীর শাড়ীর আঁচলটা তিনি ছেড়ে দিলেন।

সুহাসিনী চলে গেল।

যাবে আর কোথায় ? ওদিকের বারান্দায় ঝাঁটাগাছটা পড়েছিল, সেইটে এনে ঘরটা ঝাঁট দিতে লাগলো।

ব্রজকিশোরবাবু তখন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপনমনেই বলে চলেছেন, 'নিজের স্ত্রী যাকে বিশ্বাস করে না, কেই-বা তাকে বিশ্বাস করবে !

সুহাসিনীর মুখে কোনও কথা নেই।

ব্রজকিশোরবাবু আবার বললেন, বিনা দোষে রাস্তায় ধরে মেরেছে, এবার কোনদিন শুনবে—একেবারে শেষ করে' দিয়েছে !

সুহাসিনী একবার তাঁর মুখের পানে তাকালে মাত্র। তারপর ঝাঁটাটা বারান্দায় রেখে, হাত ধুয়ে, আসন পেতে, খাবার ঠাঁই করবার জন্যে যখন ফিরে' এলো, দেখলে, আপনমনেই গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে ব্রজকিশোরবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন ঘর থেকে।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, যাচ্ছ কোথায় ?

—যেখানেই যাই, তোমার কি ?

সুহাসিনী বললে, ছাখো, জ্বালিয়ো না বলছি ! খাবার ঠাঁই করে' দিয়েছি। বোসো।

ব্রজকিশোরবাবু আসনের ওপর বসলেন। বললেন, আর বেশী দিন জ্বালাবো না।

সুহাসিনী বোধকরি খাবার আনবার জন্য বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শুকদেও চলে যাবার পর বাড়ীর নীচেটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। গাই নেই, বাছুর নেই, ভুখন নেই, সখিয়া নেই। কেরোসিনের কুপি একটা জ্বলতো—সেটাও আর জ্বলে না। সিঁড়ির নীচেটা সন্ধ্যে থেকে অন্ধকারে কেমন যেন থম্ থম্ করে।

গোপালবাবুকে প্রায়ই ওইদিক্ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়। ওরা যখন ছিল তখনও তিনি তাদের গালাগালি দিতেন। এখন নেই, এখনও গালাগালি দেন।

—ব্যাটারা এম্‌নিই। আজ এখানে, কাল সেখানে, ব্যাটাদের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। বেশ তো ছিলি বাবা—উঃ!

বুড়ো মানুষ। অন্ধকারে হোঁচট খেলেন।

যেই হোঁচট খাওয়া—অম্‌নি যত রাগ তাঁর গিয়ে পড়লো শুকদেও-এর ওপর। অপরাধটা যেন তারই।

মুখে উচ্চারণ করা যায় না—এম্‌নি সব কদর্য্য ভাষায় শুকদেওকে গালাগালি দিতে দিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর ঘরের দিকে। এমন সময় কে যেন বলে' উঠলো, কি হ'লো গোপালবাবু?

গোপালবাবু চম্‌কে উঠলেন।

চম্‌কে ওঠা তাকে ঠিক বলা যায় না। আঁৎকে উঠলেন। ওরে বাবারে! বলে' এক পায়ে টাল সাম্‌লাতে না পেরে' সেইখানেই উল্‌টে পড়ে গেলেন।

হৈ চৈ একটা গোলমাল উঠলো। হোটেল থেকে লোকজন ছুটে'

বেরিয়ে এলো। বাচ্চু এলো। হরিশ এলো। ঠাকুর এলো। চাকর এলো। ঠেঙ্গো ঠক্ ঠক্ করতে করতে দয়াময় এসে দাঁড়ালো।

ধরাধরি করে' গোপালবাবুকে তুলে নিয়ে যাওয়া হ'লো তাঁর ঘরের ভেতর। মাথায় মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে হাওয়া করে' তাঁকে সুস্থ করে' তোলা হ'লো। চোট বিশেষ কিছু লাগেনি। গোপালবাবু উঠে বসলেন।

সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, কি হয়েছিল?

গোপালবাবুর সেই এক কথা! বলেন, ভূত।

সন্ধ্যেবেলা ভূত কোত্থেকে এলো?

কথাটা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইলে না।

গোপালবাবু বললেন, তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। ইয়া লম্বা দেখতে। কিম্ভূতকিমাকার মুখখানা। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মত গোল-গোল।

এই নিয়ে কত রকমের কত আলোচনা চলতে লাগলো।

কেউ বলে—মিথ্যা। কেউ বলে—সত্যি।

দিনের বেলা কথাটা লোকে হেসেই উড়িয়ে দেয়।

কিন্তু রাত্রে দেখা যায়, 'ইম্পিরিয়াল বোর্ডিং হাউসে'র কেউ আর ঘর থেকে বেরোতে চায় না।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম।

গোপালবাবু দেখেছিলেন ঠিক। কিন্তু ভূত দেখেননি। দেখে-ছিলেন মানুষ।

অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল ভূখন। শুকদেও-এর ভাই।

গত কয়েকদিন ধরে' রোজই সে একবার করে' আসে। দিনের বেলা লোক জানাজানি করে' এখানে তার আসবার উপায় নেই।

আসে রাত্রির অন্ধকারে চুপিচুপি চোরের মত। এসে দেখে যায়—তার দাদা শুকদেও এসেছে কি-না।

শুকদেওকে তার একান্ত প্রয়োজন।

দাদাকে দেখতে না পেয়ে ভূখন চলে যাচ্ছিল। গোপালবাবুকে আসতে দেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে পড়লো।

ভাবলে, গোপালবাবুকে ডেকে সে চুপিচুপি বলবে—তার দাদার কথা। বলবে, দাদার সঙ্গে যদি তাঁর দেখা হয় তো তিনি যেন তাকে বলেন—ভূখন এসেছিল ; আবার আসবে।

কিন্তু বুড়ো এক হোঁচট খেয়েই দিলে বিভ্রাট বাধিয়ে! কিছুই তার বলা হ'লো না। যেমন এসেছিল, আবার তেমনি চোরের মত তাকে পালিয়ে যেতে হ'লো।

শুকদেও এলো দিন-দুই পরে।

এ-জায়গাটার মায়া সে যেন কিছুতেই কাটাতে পারছে না। শুকদেও কাশী গিয়েছিল। কাশী থেকে বৃন্দাবন। ফেরার পথে গয়ায় নেমে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করে' কোথায় যাবে—ভেবে ঠিক করতে পারলে না। চড়ে বসলো কলকাতার ট্রেণে।

তার ওই এক সহোদর ভাই ভূখন ছাড়া কেই-বা আছে এ-সংসারে! কুলাঙ্গার ভাই। তবু সেই তারই জন্যে মনের মধ্যে তার ব্যাকুলতার অন্ত নেই। দেবস্থানে গেল পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়। অশান্ত মন তার শান্ত হবে ভেবে।

কিন্তু কোথায় শান্তি?

উন্মাদের মত যেখানে-সেখানে ছুটেই মরলো শুধু। দেবতার মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠুকলে। বুকের ভেতর থেকে কিসের যেন

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বারম্বার শুধু অশ্রুর ধারা হয়ে নেমে এলো ছ'চোখ বেয়ে। জানালে তার সর্ব্বান্তঃকরণের শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা—ভূখনের সুমতি দাও ঠাকুর !

দেবতার কাছে চাইবার মত শুধু তার ওই একটি কথাই আছে ! ভূখন ভাল হোক্ !

বন্ধু হরদয়ালের বাড়ীতে গিয়েই উঠলো শুকদেও।

দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলবে ?

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শহরের পথে আলো জ্বলছে। কিন্তু হরদয়াল তখনও ফেরেনি আপিস থেকে।

হাতের গাঁঠরিটা নামিয়ে রেখে শুকদেও বললে, আমি দেখি একবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে শুকদেও রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো।

হরদয়াল বাইকে চড়ে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু শুকদেও-এর নজর পথচারী পদাতিকদের দিকেই যেন বেশী।

কতদিন দেখেনি ভূখনকে। সে কি আর এ-পথ দিয়ে আসবে ? কেনই-বা আসবে !

এত বড় এই মহানগরীর কোথায় কোন্ প্রান্তে সে পড়ে আছে। আর বোধ হয় জীবনে কোনদিনই তার সঙ্গে দেখা হবে না।

এই কথাটা ভাবতে গিয়ে শুকদেও-এর চোখদুটো জলে ভরে এলো। রাস্তার লোকজন বাড়ী ঘর দোর সবকিছুই ঝাপসা হয়ে গেল।

কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে শুকদেও আপনমনেই বলতে লাগলো, হে ভগবান ! হে বিশ্বনাথ ! তা যেন না হয় !

চোখ মুছে যেই সে ভাল করে' তাকিয়েছে, মনে হ'লো দূরে ভূখনের মত কে যেন সেইদিকেই এগিয়ে আসছে।

এও কি সম্ভব? এমনি করেই কি মানুষের ব্যাকুল প্রার্থনা ভগবান শোনেন!

সত্যিই ভূখন কিনা দেখবার জন্য শুকদেও এগিয়ে গেল।

বেশী দূর যেতে হ'লো না। ভূখন ছুটে এসে শুকদেও-এর পায়ের কাছে বসে পড়ে' কাঁদতে লাগলো।

শুকদেও তাকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলে,

কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে বল?

ভূখন বললে, রোজই আমি এখানে আসি দাদা তোমাকে খুঁজতে।

শুকদেও বললে, আমি আজই ফিরেছি কলকাতায়।

পাশের বাড়ীর রকের উপর বসতে যাচ্ছিল শুকদেও। ভূখন বললে, না দাদা, এখানে নয়, কেউ দেখতে পাবে। এসো এই গলিটার ভেতর এসো—অনেক কথা আছে।

গলির ভেতর একটা নির্জ্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ভূখন একটি একটি করে' সব কথাই বললে শুকদেওকে।

প্রথমেই বললে সখিয়ার কথা। বললে, তুমি ঠিকই বলেছিলে দাদা। মেয়েটা ভাল নয়। সখিয়াকে আমি দূর করে' দিয়েছি। মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

এই বলে' সখিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার কথা সে একটি একটি করে' বলে যেতে লাগলো।

কথাগুলো শুকদেও-এর কানে ঢুকলো কিনা কে জানে! সে তখন ভাবছে অন্য কথা। মন তার চলে গেছে বহুদূরে। ভূখনের মাথায় গায়ে হাত বুলোচ্ছে আর ভাবছে, কাশীর কথা, বৃন্দাবনের কথা, গয়ার কথা। মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠুকেছে আর জানিয়েছে তার অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা। এমনি করে' এত তাড়াতাড়ি মানুষের প্রার্থনা

পূর্ণ হয় সেকথা তার জানা ছিল না। হে ভগবান! হে বিশ্বনাথ! হে করুণাময় অন্তর্য্যামী!

শুকদেও-এর চোখ দিয়ে দর দর করে' জল গড়াচ্ছে।

ভূখন বলে' চলেছে, সখিয়ার সব কথাই আমি বিশ্বাস করে-ছিলাম, অথচ কোনও কথাই তার সত্যি নয়। সব চেয়ে ও আমাদের সর্ব্বনাশ করলে দাদা—ওই বড়বাবুর নামে মিছে কথা বলে'।

শুকদেও চম্‌কে উঠলো। বললে, বড়বাবু?

ভূখন বললে, হ্যাঁ দাদা, ওই বড়বাবু, বর্‌জোকিশেনবাবু।

সখিয়া যা বলেছে সব মিছে কথা। মারের চোটে শয়তানী সব কবুল করেছে। কিন্তু দু'দিন আগে যদি বলতো দাদা, তাহ'লে যে খারাপ কাজ আমি করেছি তা আর করতাম না।

এই বলে' সে আবার কেঁদে ফেললে।

শুকদেও তাকে সান্ত্বনা দিলে। বললে, কাঁদিসনে। যা হবার হয়ে গেছে। মেয়েটাকে ছেড়ে তো দিয়েছিস্—ব্যস্।

ভূখন বললে, না দাদা, তুমি জানো না। এখান থেকে চলে যাবার পর ওই শয়তানীর কথা শুনে বড়বাবুকে আমি একদিন রাস্তায় ধরে' মেরেছি।

কথাটা প্রথমে শুকদেও ভাল বুঝতে পারেনি।

বললে, কে মেরেছে? কাকে?

ভূখন বললে, আমি মেরেছি। বড়বাবুকে।

শুকদেও থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগলো। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না।

ভূখন বললে, আমি ক্ষমা চাইবো বড়বাবুর কাছে। তুমি আমাকে নিয়ে চল দাদা।

এ-অপরাধের ক্ষমা আছে?

শুকদেও বললে, আমি মূর্খ মানুষ, কিছু বুঝি না কিছু জানি না। বড়বাবুর কাছে গিয়ে আমি দাঁড়াবো কেমন করে' ?

ভুখন বললে, তোমার সঙ্গে আমি যাব দাদা, চল।

শুকদেও কি যে করবে বুঝতে পারছিল না। হাতদুটি জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করলে। তারপর উঠে দাঁড়ালো। বললে, আয়। আগে আমি বিপিনবাবুর কাছে যাব। তুই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবি।

শুকদেও বিপদে পড়লো।

বিপিন যে এখান থেকে চলে গেছে তা সে জানতো না।

সিঁড়ির ধারে প্রথম ঘরখানাই ছিল বিপিনের। দরজাটা ছিল ভেজানো। শুকদেও ধীরে-ধীরে কপাটদুটো খুলে ফেলতেই দেখলে, ব্রজকিশোরবাবু শুয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছেন।

বুঝতে পারেনি শুকদেও।

—কে ? বলে' ব্রজকিশোরবাবু উঠে বসলেন।

শুকদেও অবাক্ !

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, কি রে ? তোরা আবার কি মনে করে' ?

শুকদেও ডাকলে, ভুখন !

ভুখনের নাম শুনেই ব্রজকিশোরবাবু ভাল করে' চেপে বসলেন। কিন্তু ভুখন এসেই যে-রকম ভাবে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে' মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে সুরু করলে, তিনি আর একটি কথাও বলতে পারলেন না। শুধু শুকদেও-এর মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকিয়ে রইলেন।

পাগলের মত ভুখন যা তা' কাণ্ড আরম্ভ করে' দিলে। মাটিতে শুধু গড়াগড়ি দিয়েই নিরস্ত হ'লো না। ক্রমাগত বলতে লাগলো, আমাকে মারুন। মেরে মেরে আমাকে শেষ করে' দিন। আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই।

বলে আর ব্রজকিশোরবাবুর একপাটি চটি জুতো নিজের মাথায় মারতে থাকে। গোলমাল শুনে সুহাসিনী এসে দাঁড়ালো।

শুকদেও হাতজোড় করে' বললে, ভুখন যে অপরাধ করেছে মা, তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আপনি ওকে ক্ষমা করুন।

সুহাসিনী বললে, তুমি ওকে ডেকে এনেছো?

শুকদেও বললে, না মা, ও নিজেই এসেছে। আমি এখানে ছিলাম না মা, আজই এসেছি কলকাতায়।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, সখিয়া কোথায়?

ভুখন এইবার উঠে কথা বললে। সুহাসিনীর মুখের পানে তাকাতে গিয়েও সে তাকাতে পারলে না। বললে, সে শয়তানীকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি মা-জি। যাবার সময় সে বলে গেছে—বাবুর কোনও দোষ নেই।

ব্রজকিশোরবাবু একবার তাকালেন সুহাসিনীর মুখের পানে। কথাটা সুহাসিনী বিশ্বাস করেনি।

ব্রজকিশোরবাবু শুকদেও-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, যা বাবা, এবার যা তোরা।

শুকদেও বললে, যাব কোথায় বাবু? গিয়েছিলাম তো ওই হতভাগার জন্যে। এবার আমরা যেমন ছিলাম তেমনি থাকবো।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, বেশ তাই থাকগে যা।

সুহাসিনী বললে, তোমরা না থাকায় নীচের বাবুরা রোজ ভূত দেখছে।

শুকদেও বললে, ভূত!

ভূতের ভুলটা ভূখন ভেঙ্গে দিলে। বললে, ভূত নয় বাবু, আমি। ভেইয়ার খোঁজ করতে এসে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম অন্ধকারে। আমাকে দেখেই গোপালবাবু আঁৎকে উঠে চেঁচাতে লাগলো। আমি চুপিচুপি পালিয়ে গেলাম।

ভূতের ব্যাপারটা ব্রজকিশোরবাবু শুনে অবধি চিন্তান্বিত ছিলেন। ভূতের ভয়ে নীচের ভাড়াটে না থাকার আশঙ্কা তো ছিলই, তা ছাড়া নিজেও তো কত রাত-বিরেতে একা একা বাড়ী ফেরেন, কাজেই ভূখনের কথা শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, বাঁচা গেল। ভূত তাহ'লে নয়।

ভূখন বললে, না বাবু।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, দাও তাহ'লে ওদেব মিষ্টি মুখ কবিয়ে দাও। অনেক কেঁদেছে।

শুকদেও বললে, মিষ্টি নয় মা, পায়ের ধূলো দিন।

প্রণাম করে' উঠেই জিজ্ঞাসা করলে, বিপিনবাবু কোথায় মা?

সুহাসিনী বললে, কি জানি বাবা, উনি যেদিন মা'র খেয়ে বাড়ী ফিবলেন সেইদিন থেকে কোথায় যে গেল কিছু বলেও যায়নি।

ভূখন বললে, আমি তাঁকে দেখেছি ভাইয়া।

শুকদেও বললে, কোথায়?

ভূখন বললে, কাল দেখেছি তেলকলেব সামনে। আর আজ যখন এখানে আসি, দেখলাম আমার পিছু-পিছু আসছেন। তারপর কোথায় গেলেন দেখতে পেলাম না।

শুকদেও বললে, কাল আমি তাঁকে একবার খুঁজে দেখবো।

সুহাসিনী বললে, না বাবা, খোঁজাখুঁজি করে' জোর করে' ধরে এনো না। তাঁর নিজের ইচ্ছে যদি হয় কোনদিন তো আসবেন।

ব্রজকিশোরবাবু বললেন, তার বিছানা বাক্স সবই তো এইখানে পড়ে আছে।

সুহাসিনী বললে, হ্যাঁ। অদ্ভুত মানুষ!

শুকদেও বললে, ও-রকম মানুষ খুব কম দেখেছি মা।

—আর তুমি নিজে?

সবাই চম্‌কে উঠলো।

ঘরে ঢুকলো বিপিন।

সুহাসিনী একটি কথাও বললে না। বিপিনের মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে' যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

ব্রজকিশোরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গিয়েছিলে?

ভূখনকে দেখিয়ে দিয়ে বিপিন বললে, একে খুন করতে।

বলেই সে শুকদেও-এর মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, এতদিন পরে কাল তোমার ভাইটিকে খুঁজে বের করেছি মাণিকতলার তেলকলে। আজ যদি ও এখানে এসে ক্ষমা না চাইতো তো কি হতো বলা যায় না। আমার সঙ্গে ছিল যতীনদা। চেনো তো যতীনদাকে?

'ওরে বাবা, তা আবার চিনি না!' যতীনবাবুর উদ্দেশে একটি প্রণাম করে' শুকদেও বললে, কোথায় যতীনবাবু?

বিপিন বললেঃ নীচের মজলিসে। ভূতের গল্প চলছে। গোপালবাবু নাকি একদিন ভূত দেখেছেন।

ব্রজকিশোরবাবু আঙুল বাড়িয়ে ভূখনকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, ওই তো ভূত!

বিপিন তখনও বুঝতে পারেনি আসল কথাটা। তাই একবার হেসে উঠলো মাত্র।

কিন্তু ভূতের রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে বলে' ব্রজকিশোরবাবুর আনন্দ যেন সব-চেয়ে বেশী। তিনি বুঝিয়ে দিলেন বিপিনকে, ভূখন সেদিন তার দাদাকে খুঁজতে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখেই ভূত বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল গোপালবাবু।

—তাই নাকি ?

কথাটা শুনে বিপিন হাসতে লাগলো।

হাসতে হাসতে মুখ ফেরালে সুহাসিনীর দিকে। বললে, হাসি, আজ তাহ'লে ভূত-ভোজন হয়ে যাক্। ভূত খাবে, ভূতের দাদা খাবে, আমি খাব আর খাবে আমাদের যতীনদা।

—হ্যাঁ, রান্না চড়াইগে।

সুহাসিনী চলে যাচ্ছিল। শান্ত আনুগত্যের একটি নারীসুলভ চঞ্চলতা তার সারা দেহে।

দোরের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, বাজার যেতে হবে। এসো।

বিপিন তার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শুকদেও আর ভূখনকে বলে গেল যেয়ো না তোমরা, আজ এখানে খাবে।

বন্ধু হরদয়ালের অতিথি সে আজ। তার খাবার বোধ হয় সেইখানেই তৈরি হবে। কিন্তু প্রতিবাদ করবার ভাষা খুঁজে পেলে না। হাত জোড় করে' সেইখানেই বসে পড়লো শুকদেও। ভূখনকে বললে, হরদয়ালের বাড়ীতে গিয়ে বলে আয়—আজ আমি এইখানেই প্রসাদ পাব।

ভূখন উঠে গেল।

জানালার বাইরে মনে হচ্ছে যেন নিম গাছটার পাতার ফাঁকে অন্ধকার আকাশ চিরে এক ফালি চাঁদ উঠছে।